আপেক্ষিক মূল্যায়নে রামায়ণ ও মহাভারত

সুকুমারী ভট্টাচার্য

আপেক্ষিক মূল্যায়নে রামায়ণ ও মহাভারত

সুকুমারী ভট্টাচার্য

গাঙচিল

৩

আপেক্ষিক মূল্যায়নে রামায়ণ ও মহাভারত

দু'টি কথা

রামায়ণ আকৃতিতে অনেক ছোট। মহাভারতের এক-চতুর্থাংশেরও কম। কাজেই এটা পড়ে শেষ করা এবং রসগ্রহণ করাও কম সময়সাপেক্ষ। তা ছাড়া সাধারণ পারিবারিক সমস্যা বাদ দিলে থাকে যুদ্ধ। এই যুদ্ধে সত্যকার জটিলতা খুব কম, ফলে এর রসগ্রহণ করা আপেক্ষাকৃত সহজ। চিরদিনই মানুষ সহজ পেলে কঠিনকে বর্জন করে; এখানেও কতকটা সেই ব্যাপারই ঘটেছে। যাকে সহজ বুঝি তা যেমন সহজে জীবনের অঙ্গাঙ্গী অংশ হয়ে ওঠে, কঠিন তা হয় না। সে দাবি করে ঐকান্তিক মনোযোগ এবং একনিষ্ঠ চিন্তা। মহাভারতের এই দাবিই তাকে দুরূহতর করেছে। কিন্তু, যে যথাযথ আগ্রহ ও নিষ্ঠায় অন্তর দিয়ে, মহাভারতের মূল সন্ধান করে সে পায় বেশি। জীবননিষ্ঠ জীবনবোধ। মহাভারত এই কারণে মহত্তর। বর্তমান প্রবন্ধটিতে ভারতের দুই মহাকাব্য— রামায়ণ ও মহাভারতের, যথাক্রমে জনপ্রিয়তা ও জীবননিষ্ঠা নিয়ে একটি তুলনামূলক আলোচনার চেষ্টা করেছি। 'গাঙচিল' থেকে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ সংকলনের জন্য লেখাটি যথাসম্ভব পরিমার্জিত করার চেষ্টা করেছি। এর পাদটীকাগুলি পুণের সংশোধিত সংস্করণের মহাভারত এবং গোরখপুর গীতা প্রেস-এর রামায়ণ থেকে নেওয়া।

রামায়ণের সহজ আবেদন

বেদ ভারতবর্ষের ব্যাপক জনসাধারণের ধর্মগ্রন্থ নয়, তা হল রামায়ণ ও মহাভারত। এ দেশে গত দু'হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে মানুষ তার সংকটের মুহূর্তে যে গ্রন্থ থেকে দিকনির্দেশ খুঁজছে তা হল এই দুটি মহাকাব্য। অতএব এর পর্যালোচনার দাবিটি উপেক্ষা করা যায় না।

দুটি মহাকাব্যেরই পরিণতি এসেছে একটি বড় মাপের যুদ্ধের পরে। অপহৃত সীতাকে উদ্ধার করবার জন্য রাম-লক্ষ্মণ বানরসেনার সাহায্য নিলেন। বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বানররাজ সুগ্রীব তাঁর অনুচরদের ভিন্ন ভিন্ন দিকে পাঠিয়ে সীতার সন্ধান করলেন, এবং পরে রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে সসৈন্যে গিয়ে সমুদ্রে সেতুবন্ধ নির্মাণ করে অন্যপারে লঙ্কায় উত্তীর্ণ হলেন। বানরসেনা কিন্তু সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, যা অস্ত্রশস্ত্র তা ওই রাম লক্ষ্মণ দু-ভাইয়ের। তারই বা পরিমাণ কত হতে পারে? হনুমান যখন লঙ্কায় গিয়ে ঘুরে সব দেখছিলেন তখন কিন্তু একটি সমৃদ্ধ রাজ্যের রাজধানীর সমস্ত সম্ভার এমনকী প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধের উপকরণ সেখানে দেখতে পেয়েছিলেন।[১] যুদ্ধে রাক্ষসসেনা সুশিক্ষিত ও সশস্ত্র মানুষ সেনার মতোই লড়াই করেছিল। অযোধ্যায় সামরিক প্রস্তুতি ও সাজসজ্জা যে রকম, লঙ্কাতেও ঠিক সেই রকমেরই ছিল। ব্যতিক্রম বানর সেনা; যারা নিরস্ত্র, শুধু হাতে পাথর ছুঁড়ে, গাছ উপড়ে ফেলে যুদ্ধ করেছিল। রামের সেনা বলতে এরাই। শিক্ষিত রাক্ষসসেনা হেরেছিল এই নিরস্ত্র বানরসেনা এবং দুটিমাত্র অস্ত্রধারী যোদ্ধা— রাম, লক্ষ্মণের কাছে। এই সাংঘাতিক অসম যুদ্ধে একটা অতিলৌকিক উপাদান থাকবেই এবং ছিলও। গন্ধমাদন পর্বত বয়ে নিয়ে আসা এবং সেখানকার ভেষজ বিশল্যকরণীর সাহায্যে যুদ্ধে প্রায়-পরাস্ত হতচেতন লক্ষ্মণের জ্ঞান ফিরে আসে। যুদ্ধে মায়া-সীতা দেখানো, রামের মুণ্ড দেখানো এবং নানা মুনিঋষি এবং দেবতাদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ, এ সবই অলৌকিক ঘটনা।

বিস্তর অলৌকিক ঘটনা সারা রামায়ণ জুড়েই আছে। গল্পের শুরু ঠিক রূপকথার মতোই: এক রাজা, তাঁর তিন রানি, রাজার হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, কিন্তু রাজার ছেলে হয় না। ছেলে যে হল সে-ও রূপকথারই মতো অলৌকিক শক্তির সাহায্যে। তার পর কিশোর রাম-লক্ষ্মণকে নিতে এলেন বিশ্বামিত্র। তাঁর আশ্রমে রাক্ষসরা বেজায় দৌরাত্ম্য

১. সুন্দরকাণ্ড; (৪:৫)

করছে, তাদের ঠেকাতে হবে। প্রথমত, রাক্ষসরা ভয়ানক শক্তিশালী জীব, তাদের হারাতে নিয়ে যাওয়া হল দুটি কিশোরকে। পথে অহল্যার কাহিনিতে দেখানো হল রাম সাধারণ মানুষ নন। যাই হোক, বিশ্বামিত্রের আশ্রমে রাক্ষসদের হারানো, এও প্রায় অলৌকিক ঘটনারই পর্যায়ে পড়ে। তার পরে বিয়ে। ওই কিশোরই হরধনু ভাঙল, যা বড় বড় বীর পারেনি। বিয়ের কিছুকাল পরেই যৌবরাজ্যে অভিষেকের সময়ে সব কিছু ভেস্তে গেল কৈকেয়ীর আবদারে: কবে তাঁর সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে দশরথ দুটি বর দিয়েছিলেন, সেই সুবাদে রামকে বনবাস দিয়ে ভরতকে রাজা করার দাবি তুললেন কৈকেয়ী, এবং পূর্ব প্রতিশ্রুতির দায়ে রাজাকে তা-ই করতে হল। এখানে রূপকথার অন্য একটি আনুষঙ্গিক অংশ জুড়ল; রাজার ছেলে বনবাসী হল। এটা বহু রূপকথায় ঘটেছে।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বনে গেলেন। এখানে তাঁদের জীবনের দুটি অংশ: এক, দৈনন্দিন জীবনে ক্লেশ, কুঁড়ে ঘরে বাস, ফল পাকুড় এবং শিকারের মাংসে দিনযাত্রা নির্বাহ। এর অবশ্য একটি কাব্যিক দিকও আছে। কিন্তু বনে কখনও বাঘ সিংহ তাঁদের আক্রমণ করেনি, সাপ-বিছে কামড়ায়নি। এত অহিংস জঙ্গল বাস্তবে মেলে না। দ্বিতীয়ত, এখানে ওই সদ্য তরুণ দুটি রাজপুত্র, ধনুর্বাণ, বর্শা, তরবারি দিয়ে হাজার হাজার ভয়ংকর রাক্ষসকে প্রায়ই মেরে ফেলতে লাগলেন। এ অংশটা স্পষ্টতই অলৌকিক। যদি মনে রাখি যে, আদিকাণ্ডের প্রথমার্ধ ও উত্তরকাণ্ড বাদে বাকি অংশটাই আদি রামায়ণ এবং এ অংশে রাম বিষ্ণুর অবতার নন, 'নরচন্দ্রমা',[২] তা হলে সামান্য অস্ত্রে দুটি তরুণের হাতে প্রচণ্ড শক্তিশালী অগণ্য রাক্ষসের মৃত্যু— এ-ও অলৌকিক উপাদান। বনবাস পর্বে কিছু বৈচিত্র্য সঞ্চার ঘটেছে, খরদূষণ-তাড়কা-শূর্পণখা উপাখ্যানে; এরা সবাই রাম লক্ষ্মণের হাতে পরাস্ত হয়েছে, অপমানিত হয়েছে ও নির্যাতিত হয়েছে।

এই নির্যাতনের খবর পৌঁছেছে লঙ্কায়, সেখানে রাজা রাবণ রাম লক্ষ্মণকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছায় সীতা হরণের জন্য মারীচের শরণ নিলেন। মারীচ এল সোনার হরিণের রূপ ধরে; আরও একটা অলৌকিক মাত্রা যুক্ত হল কাহিনিতে। সোনার হরিণ দেখে সীতা জেদ ধরলেন, ওই সোনার হরিণ তাঁর চাই। রাম হরিণের পিছু পিছু গেলেন। কুটীরে লক্ষ্মণ ও সীতা শুনতে পেলেন রামের গলা, 'বাঁচাও'। সীতা জোর করে লক্ষ্মণকে পাঠালেন রামের নিরাপত্তার জন্যে। এ বার কুটীরে একলা সীতার কাছে ছদ্মবেশী রাবণ ভিক্ষা নিতে এসে জোর করে তাঁকে রথে তুলে রওনা হলেন। ছদ্মবেশও একটা অলৌকিক ব্যাপার, পুষ্পক-রথও তাই। লঙ্কায় সীতাকে অশোকবনে বন্দিনী করে রাখা হল, কারণ তিনি রাবণকে ভজনা করতে সম্মত হননি। রাবণ ধমকে বলে গেলেন, দু-মাসের মধ্যে সীতা রাজি না হলে তাঁকে মেরে কেটে খাওয়া হবে।

২. শ্রূয়তাং তু গুণৈরেভির্যো যুক্তো নরচন্দ্রমাঃ, (১:১১)

এদিকে রাম কুটীরে ফিরে সীতাকে না দেখতে পেয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। ঘটনাচক্রে সুগ্রীবের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব হল, এটাও লৌকিকের সীমা ছাড়িয়ে; মানুষে-বানরে বন্ধুত্ব। বলা বাহুল্য, এ-বানর পরিচিত সলাঙ্গুল বানরের মতো নয়, এরা মানুষের মতো কথা বলে, এবং এদের আচরণও মানুষেরই মতো। চর পাঠিয়ে সুগ্রীব সীতার সন্ধান পেলেন। হনুমান গেল লাফ দিয়ে সাগর পর্বত বনজঙ্গল পেরিয়ে— এ-ও অতিলৌকিক ঘটনা। তেমনই অতিলৌকিক পথে রাক্ষসী সিংহিকাকে মেরে ফেলার ঘটনা। রাম লক্ষ্মণ বানরসেনার সাহায্যে যে সমুদ্রে সেতুবন্ধন করলেন সেও সাধারণ সম্ভাব্যতাকে লঙ্ঘন করে। যুদ্ধে অতিলৌকিক ঘটনা বেশ কয়েকটাই ঘটে, কিন্তু নিরস্ত্র বানরসেনার হাতে ও ধনুর্বাণধারী রামলক্ষ্মণের হাতে সুশিক্ষিত সশস্ত্র রাক্ষসসেনার পরাভব, এইটেই সবচেয়ে বড় অলৌকিক। যুদ্ধের পরে রাম সীতাকে সর্বজনসমক্ষে পরিত্যাগ করলে সীতা চিতারোহণ করেন। দেবতারা ও দশরথ এসে তাঁর 'সতীত্ব' প্রতিপাদন করেন, এটাও অলৌকিক। যেমন অবাস্তর পুষ্পক রথে দেশে ফেরা।

কাজেই দেখছি, পদে পদে অলৌকিকতার অবতারণা এবং রূপকথার মতো দুর্বল পক্ষের সবল পক্ষকে পরাস্ত করা এ সবই ব্যবহার করা হয়েছে, কাহিনিটিকে বাস্তব অর্থাৎ মানুষের পরিচিত জগৎ থেকে সরিয়ে অন্য এক স্তরে উন্নীত করবার জন্যে। সেখানে বাস্তব অবাস্তবের ভেদ নেই, গল্পের মধ্যে কাহিনিগত, চরিত্রগত বিশেষ কোনও জটিলতা নেই। যখনই কাহিনির প্রয়োজনে কোনও ব্যাপার ঘটা দরকার, যেটা বাস্তবে ঘটা অসম্ভব, তখনই অতিবাস্তবের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এতে কাহিনিটির জনপ্রিয় হওয়া আরও সহজ হয়েছে। লোকে বারে বারে সুন্দর প্রকৃতি বর্ণনা পেয়েছে, কাহিনির মধ্যে পেয়েছে রোমহর্ষক উপাদান এবং অলৌকিকের বহুল প্রয়োগ, যা রূপকথার উপাদানের মতো এটিকে জনপ্রিয় করতে সাহায্য করেছে।

জীবনের যে ধরনের মূল্যবোধ রামায়ণে প্রতিফলিত হয়েছে তা মূলত পরিবারনিষ্ঠ। পিতা-পুত্র (রাম-লক্ষ্মণ ও দশরথ, রাবণ-ইন্দ্রজিৎ), মাতা-বিমাতা (কৌশল্যা-কৈকেয়ী), পারিবারিক ক্ষমতালোভে ষড়যন্ত্র (কৈকেয়ী-মন্থরার রামের বিরুদ্ধে ভরতের দাবি উপস্থাপন করা), সৌভ্রাত্র্য (রাম, লক্ষ্মণ, ভরত), ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, (বালী-সুগ্রীব, রাবণ-বিভীষণ), পরস্ত্রীহরণ ও ভোগ বা ভোগের চেষ্টা (রুমা-তারা, সীতা), বন্ধুকৃত্য (জটায়ু-সম্পাতি রামলক্ষ্মণের সহায়তা করেন দশরথের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে), দাম্পত্যের ত্রুটি ও বিকৃতি (বালী-সুগ্রীব-রাবণ), অনুচরের আনুগত্য (হনুমান), দাসীর দৌরাত্ম্য (মন্থরা), ভ্রাতৃবধূ-দেবর (সীতা-লক্ষ্মণ), আরও ছোটখাটো শাখায় পল্লবে নানা উপকাহিনিতে এই ধরনের পারিবারিক মূল্যবোধের কথাই ঘুরে ফিরে এসেছে। সমাজের মানুষ প্রতিনিয়ত অব্যবহিত ভাবে যে সব সম্পর্কের জটিলতার সম্মুখীন হয় এবং প্রায় প্রত্যহ পদে পদে যে সব সমস্যা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়, রামায়ণ সেই নীতি-দুর্নীতি-সুনীতির সম্বন্ধে পারিবারিক ও কতকটা সামাজিক অক্ষাংশে তার সম্বন্ধে দিকনির্দেশ দিয়েছে। পরিবারবদ্ধ সমাজজীবনে মানুষ স্বভাবতই চেয়েছে

পারিবারিক সম্পর্কে সংঘাত ও সংশয়ে মহাকাব্যের কাছ থেকে আচরণের বিধি ও মূল্যবোধের দিশা। পারিবারিক সম্পর্কের সংঘর্ষে কী করণীয়, কেমন ভাবে তা করণীয়, তা দেখাক মহাকাব্য।

খ্রিস্টিয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে কুষাণ সাম্রাজ্যের কালে ভারতবর্ষে একটি ব্যাপক অন্তর্দ্বন্দ্ব, মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব ঘটে। এর ফলে প্রচলিত সমাজবিধির বিশ্লেষণ করে নতুন, সার্বিক ভাবে গ্রহণীয় যে আচরণবিধি প্রবর্তিত হল, সেই পরিবর্তিত বিধানই হল এই মূল্যবোধের উৎস। রামায়ণের সমকালীন ভগবদগীতা, বাৎস্যায়নের কামসূত্র, মনুসংহিতা, সংস্কৃত জাতকের কিছু অংশেও এই মূল্যবোধই প্রতিফলিত। এর বিশদ আলোচনা না করেও সাধারণ ভাবে বলা যায়— জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার বিকল্প, অতএব সর্বতো ভাবে তাঁর বাধ্য হওয়া উচিত। পিতা দেবকল্প, তাঁর আদেশ নির্দেশ একান্ত ভাবেই অলঙ্ঘনীয়।[৩] বন্ধুর দাবি রক্ষণীয়। অনুগতের আশ্রয়স্থল হওয়ার দায়িত্ব আছে। দাম্পত্যে স্বামীই প্রভু, স্ত্রীর স্থান তার অনেক নিচে; কাজেই স্বামীর সেবা ও অভিলাষপূরণ স্ত্রীর একান্ত কর্তব্য। যত দিন দাম্পত্যপ্রেম উভয়ত প্রবাহিত, তত দিন স্ত্রীর একটা স্থান আছে। কিন্তু সম্পূর্ণ নির্দোষ স্ত্রীকেও সন্দেহ বশে বারবার প্রত্যাখ্যান করা সংগত; কারণ সমাজে 'সতীত্ব' একটি সর্বজনস্বীকৃত মূল্য। কিন্তু 'সতী'র কোনও পুংলিঙ্গ প্রতিশব্দ না থাকায় স্বামীকে স্ত্রী-র সন্দেহ করার হেতু থাকলেও কোনও অবকাশ থাকে না। বংশমর্যাদা একটি সমাজস্বীকৃত মূল্য। তাই যুদ্ধ শেষে রাম সীতাকে বলতে পারলেন, 'যুদ্ধ করেছি ইক্ষ্বাকু কুলের মর্যাদা রক্ষার জন্য', অর্থাৎ তোমার জন্যে নয়। তাই যুদ্ধের শেষে অযোধ্যার সিংহাসন পেলেন ভরত, রামের বৈধ উত্তরাধিকারী লব কুশ নয়। শূদ্র ও চণ্ডাল ঊনমানব, তাই গুহক চণ্ডালের কাছে ফলমূলও গ্রহণ করা যায়নি (যদিও বনবাসী অবস্থায় মুনিঋষিদের আতিথ্য গ্রহণ করতে রামের বাধেনি)।[৪] আর ব্রাহ্মণ সন্তানের বাজারদর চণ্ডালের প্রাণের চেয়ে অনেক বেশি, তাই অকালমৃত ব্রাহ্মণ সন্তানের প্রাণের মূল্য শোধ করতে হল চণ্ডাল শম্বুককে নিজের প্রাণ দিয়ে। দু-একটা ব্যতিক্রমী চরিত্র বা ঘটনা থাকা সত্ত্বেও এই হল ওই সময়কার সমাজের মূল্যবোধের ছক। নারীর বা শূদ্রের সামাজিক অবস্থান উচ্চত্রিবর্ণের ও পুরুষের পায়ের নিচে।

ধর্মশাস্ত্র ও সমাজপতিরা যে ছকটি ধরে দিয়েছিল তা নিয়ে রামায়ণে কোনও সংঘাত নেই। মূলত পরিবারনিষ্ঠ ও সমাজনিষ্ঠ এ মূল্যবোধ সরলরৈখিক ভাবে রামায়ণে উপস্থাপিত হয়েছে। এ মহাকাব্যে সাড়া দিতে পাঠক শ্রোতাকে তাই তেমন কোনও মানসিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয় না। কাহিনিটিকে প্রচুর রূপকথার উপাদানে মণ্ডিত করে, অলৌকিকতায় ভরে দিয়ে সমৃদ্ধ বর্ণনার মধ্যে দিয়ে নারীর অবদমন, শূদ্রের সেবকত্ব, চণ্ডালের উপান্তবর্তিত্ব, রাজার গৌরব, স্বামীর সর্বময় কর্তৃত্ব, পিতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতার দেবতুল্য মহিমা প্রচার অতি সহজ ভাবে করা হয়েছে। আরও সহজ হয়েছে এর প্রক্ষিপ্ত অংশে মানুষ রামের বিষ্ণুর

৩. বালকাণ্ড; (১:১১)
৪. অযোধ্যাকাণ্ড; (১১৭:৫, ১১৮-১১৯)

অবতার হয়ে ওঠায়, সীতার লক্ষ্মীস্বরূপিণী বলে উল্লেখিত হওয়ায়। কেউ কখনও প্রশ্ন করেনি যে, লক্ষ্মীর ত পূর্বজন্মে কোনও পাপ থাকার কথা নয়, তা হলে সীতা শেষ দুটি কাণ্ডে এত নির্যাতন, প্রকাশ্য অপমান, ও বারবার নির্বাসনের যন্ত্রণা ভোগ করলেন কেন। এ কেন'র উত্তর অতিকথায় মিলবে না, মিলবে তৎকালীন আর একটি মূল্যবোধে: স্ত্রী যথার্থ সতী না হলে সন্তানের পিতৃত্ব সংশয়িত হয় এবং সন্তানই তো পিতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী; কাজেই স্ত্রীর প্রতি অহেতুক সন্দেহের উদ্রেক হলেও তাকে ত্যাগ করা চলে। নইলে ঋষি বাল্মীকি যার সতীত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে উক্তি করেন তাকেও গ্রহণ করতে বাধে স্বামীর? অযোধ্যার লোকে বলেছিল,[৫] পরহস্তাগতা নারীকে যদি রাম গ্রহণ করেন তবে তো আমাদেরও ব্যাভিচারিণী স্ত্রীকে গ্রহণ করতে হবে। সমাজে এখনও পর্যন্ত এই জাতীয় মূল্যবোধেরই আধিপত্য এবং এই মূল্যবোধকে ঘটনাপ্রবাহের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করে রামায়ণ। এক দিকে তার রূপকথাধর্মিতা, অলৌকিকত্ব-সিঞ্চিত কাহিনির অতি সহজ আবেদন, অন্য দিকে মানুষ যে মানদণ্ড ধরে নির্দ্বন্দ্বে জীবন অতিবাহিত করতে চায় তার এমন সরল উপস্থাপনা— কাজেই রামায়ণের জনপ্রিয়তা অবশ্যম্ভাবীই ছিল। এ মহাকাব্যে সাড়া দিতে হলে কোনও বিশেষ নৈতিক দ্বিধাদ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয় না, যা কিছু নৈতিক সংঘাতের উপাদান ছিল কাহিনিতে তার নিঃসংশয় সমাধান ঘটেছে; পাঠকশ্রোতা আদর্শ হিসেবে এ মূল্যবোধ মেনে নিলে তাকে বড় কোনও মানসিক সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হয় না। সাধারণ পাঠক এ-ই চায় এবং রামায়ণ কাব্য-সুষমায় মণ্ডিত করে তাকে এটাই দিয়েছে, কাজেই সমগ্র আর্যাবর্তে রামায়ণের অপ্রতিদ্বন্দ্ব জনপ্রিয়তা ঘটেছে। রামায়ণে কিছু কিছু নৈতিক সংঘাত অবশ্যই আছে, সেগুলির গুরুত্বও অনস্বীকার্য, তবু সেগুলি সংখ্যায় কম এবং অধিকাংশ সংঘাতই পাঠককে উদ্‌ভ্রান্ত বা যন্ত্রণাতুর করে তোলে না। পরিমাণগত ভাবে তাই এই কাব্যের সংকট এর সহজ আবেদনকে জটিল করে তোলেনি।

৫. উত্তরকাণ্ড; (৪৩:১৯)

মহাভারতের দ্বন্দ্ব

মহাভারতে কিন্তু পারিবারিক সম্পর্কগুলি রামায়ণের মতো আদর্শ ভাবে চিত্রিত নয়। অযোধ্যায় প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রে বিমাতার বিদ্বেষ রামচন্দ্রের বনবাসের হেতু, কিষ্কিন্ধ্যায় বালী-সুগ্রীবের বিরোধ ও লঙ্কায় বিভীষণের পক্ষে জ্যেষ্ঠের আনুগত্য ত্যাগ, ব্যতিক্রমী ঘটনা বলতে এই ক'টিই। না হলে দশরথের চারটি পুত্রের মধ্যে আদর্শ সৌভ্রাত্র্য, মৃত্যুকালে বালী ও সুগ্রীবের পুনর্মিলন ও সুগ্রীবের হাতে বালীর নিজপুত্র অঙ্গদকে সমর্পণ, লঙ্কায় রাবণ, শূর্পণখা, কুম্ভকর্ণের সৌভ্রাত্র্য (যেমন জটায়ু সম্পাতিরও), এবং সর্বত্রই স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্য, পিতার প্রতি পুত্রের বাধ্যতা— বন্ধুদের মধ্যে সখ্য, গুরুজনদের প্রতি বশ্যতা, এ সব নৈতিক আদর্শ অনুসারেই চিত্রিত হয়েছে। মহাভারতে প্রাথমিক বিরোধই হল এক বংশের দুই ধারার মধ্যে তৎকালীন সম্পর্কে যারা ভাই। বিরোধ সম্পত্তি অর্থাৎ সিংহাসনে অধিকার নিয়ে এবং বিষয়টি সত্যিই জটিল, সহজে সমাধেয় নয়। যুধিষ্ঠিরের জন্ম আগে, সে দিক থেকে সিংহাসনে তাঁর অগ্রাধিকার; কিন্তু তাঁর জন্ম পাণ্ডুর ঔরসে নয়, এবং পাণ্ডুর প্রজনন ক্ষমতা না থাকা তাঁর অধিকারকে বিসংবাদিত করে। তেমনই ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধত্বও তৎকালীন আইনে সিংহাসনে তার অধিকারকে সংশয়িত করে। কাজেই বিষয়টি জটিল ও সমস্যাসংকুল।

রামায়ণে সীতাকে হরণ করে কামুক এক রাক্ষস; মহাভারতে দ্রৌপদীর ওপরে কামনা ছিল দুর্যোধন ও কর্ণের। হরণ না করলেও প্রকাশ্য সভায় তাঁর অকথ্য অসম্মান ঘটায় যারা, তারা সম্পর্কে তাঁর ভাসুর; এবং জড়বৎ আচরণ করে সে অসম্মানকে সহ্য করেন যাঁরা তাঁরা তাঁর শ্বশুর। রামায়ণে সম্পর্কে শ্বশুর-স্থানীয় (দশরথের সখা) জটায়ু বন্ধুপুত্রের বধূকে অবমাননা থেকে রক্ষা করতে চেয়ে প্রাণই দিলেন। দ্রৌপদীকে একবার জয়দ্রথ হরণ করে, কিন্তু স্বল্প কালের মধ্যেই সে দণ্ডিত হয় এবং ওই হরণের অভিযোগে— পরপুরুষের স্পর্শের দোষে— সীতাকে রাম যেমন প্রত্যাখ্যান করেন, পঞ্চপাণ্ডবের মনে কিন্তু দ্রৌপদীহরণের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বৈকল্য দেখা দেয়নি।

রামায়ণের যুদ্ধ দূরদেশবাসী অনাত্মীয়, অপরিচিত, শত্রুপক্ষ রাক্ষস রাবণের সঙ্গে; মহাভারতে তা নয়। ওখানে কারণটা খুব সঙ্গত ছিল; রাবণ রামের স্ত্রীকে হরণ করেছিল। মহাভারতে যুধিষ্ঠির পৈত্রিক অধিকারে সিংহাসন দাবি করলে শকুনির পরামর্শে যুধিষ্ঠিরকে দ্যুতক্রীড়ায় আহ্বান করা হয়। যুধিষ্ঠির খেলায় দক্ষ ছিলেন না, কিন্তু রাজি না হলে সম্মানহানি

হবে এ আশঙ্কায় রাজি হন এবং একে একে সব কিছু পণ রেখে হারিয়ে সর্বস্বান্ত হলেন। পরে ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীকে বর দিলে তিনি একে একে স্বামীদের মুক্তি চেয়ে নিলেন। তখন আবার শকুনিকে দিয়ে কর্ণ ও দুর্যোধনের পরামর্শে যুধিষ্ঠিরকে দ্যুতক্রীড়ায় আহ্বান জানান এবং দ্বিতীয় বারেও একে একে সমস্ত সম্পত্তি, চার ভাইকে, নিজেকে ও দ্রৌপদীকে পণ রেখে হারিয়ে শর্ত অনুসারে দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস স্বীকার করে বনে চলে যান।[১]

এই উপাখ্যানের মধ্যেই নিহিত আছে মহাভারত সম্পর্কে জনসাধারণের সংবেদনে একটা গুরুতর প্রত্যবায়। দ্রৌপদী যে প্রকাশ্য রাজসভায় লাঞ্ছিত হলেন এ ব্যাপারটার কোনও সরব প্রতিবাদ তেমন হল না। প্রথম দ্যূতসভায় বিদুর প্রতিবাদ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর তো কোনও সামাজিক, রাষ্ট্রিক বা এমনকী পারিবারিক প্রতিপত্তিও ছিল না, যার বলে লোকে তাঁর কথায় কর্ণপাত করবে; ফলে সে কথা উচ্চারিত হল বটে, কিন্তু উপেক্ষিত হল সম্পূর্ণ ভাবে। দ্বিতীয় দ্যূতসভায় বিকর্ণ সকলের বিবেকের কাছে আবেদন করলেন এই বলে যে, কাজটা ক্ষত্রিয় নীতি, রাষ্ট্রনীতি ও ন্যায়নীতিরও বিরুদ্ধ। কিন্তু বিকর্ণ এমন কেউ নন যে, লোকে তার কথায় সাড়া দেবে। বলা বাহুল্য, বিদুর ও বিকর্ণ পাঠক শ্রোতার প্রতিবাদই উচ্চারণ করছেন এবং জীবনে যেমন প্রায়শই ঘটে তেমনই, এখানেও সুবিচারের জন্য আবেদন উপেক্ষিত হল। এক অর্থে এই-উপেক্ষার মধ্যেই দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার অভিঘাত পাঠকের বিবেক ও বোধের কাছে তীব্রতর হল এবং সমস্ত ব্যাপারটিকে জটিল করে তুলল। এখানে মহাভারতের পাঠক বা শ্রোতা কী দেখছে? ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, সঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্র এঁরা চুপ করে রইলেন, ন্যায়নীতির কোনও প্রশ্ন তুললেন না। বনবাস ও অজ্ঞাতবাস পাণ্ডবদের, কিন্তু অপমান ও লাঞ্ছনা প্রধানত দ্রৌপদীর।

দ্রৌপদী কে? একজন বিবাহিতা নারী, যাঁর স্বামী তাঁকে পণ রেখে জুয়া খেলে হেরেছেন। অর্থাৎ যে স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীকে রক্ষা করা বিপদ অসম্মান থেকে, সেই স্বামীই স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে ঠেলে দিলেন তাঁকে মর্মন্তুদ অপমানের মধ্যে। নারীকে অপমান করা এমন কিছু অভাবনীয় ব্যাপায় নয়। শ্রোতা-পাঠকদের খানিকটা বিস্ময় উদ্রেক করলেও ব্যাপারটা বিবমিষা উৎপাদন করেনি। কিন্তু অবচেতনে সকলেরই একটা অস্বস্তি ছিল: দ্রুপদরাজকন্যা অপূর্ব রূপবতী, বহুগুণবতী, অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্না এই নারী যে প্রকাশ্য রাজসভায় অবমানিত এবং কেশাকর্ষণ, বেশাকর্ষণের মতো জঘন্য নির্যাতন ভোগ করলেন, এতে পুরুষশাসিত ও পুরুষপ্রধান সমাজের মানুষ প্রত্যক্ষ ভাবে এর কোনও প্রতিবাদ না দেখেও অন্তরের অন্তঃস্থলে অবশ্যই কতকটা বিচলিত বোধ করেছিলেন। কারণ সমস্তটাই ছিল প্রথম থেকে নিবার্য: যুধিষ্ঠির জানতেন জুয়াখেলা পাপ, একবার হেরেও তাঁর চৈতন্য হয়নি, দ্বিতীয় বার সে পাপে যোগ দিলেন শকুনির মতো দুরাত্মার আহ্বানে। তার পর পাঁচ ভাইয়ের স্ত্রীকে একা

১. সভাপর্ব; (৫৩:২৮-৩৩)

যুধিষ্ঠির পণ রাখেন কোন অধিকারে? বড় ভাই পিতার মতো মাননীয়, কিন্তু বড় ভাই যেখানে বাকি চার ভাইয়েরও স্ত্রীর স্বামী, সেখানে তাঁর অন্য এক দায়িত্ব; জ্যেষ্ঠাধিকারের একটা সীমা আপনিই সংকুচিত হয়, তাই সেখানে যুধিষ্ঠির অন্যায় করেছেন। দ্বিতীয়ত, দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা ছিল প্রতিকার্য, এবং সেটা নিবারণ করার দায় ছিল স্বামী, শ্বশুর, ভাসুর, গুরু-আচার্যদের, সমগ্র ক্ষত্রিয় সমাজের এবং সমগ্র পুরুষ সমাজের। বিদুর, বিকর্ণ, আর ভীম ছাড়া ক্ষত্রিয়োচিত, পুরুষোচিত এবং মানবোচিত প্রতিক্রিয়া কারও কাছেই পাওয়া যায়নি। পাঠক এতে কী ভাবে সাড়া দেবেন? সাহিত্যের কাছে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা চিত্তবিনোদন, রামায়ণ তা স্পষ্টতই স্বীকার করেছে; এ কাব্যে মনোরঞ্জনের উপকরণ প্রচুর। কিন্তু যেহেতু মহাকাব্য একটা যুগের, একটা জাতির অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর বহন করে, তাই তার মধ্যে মহত্ত্বের উপাদান সঞ্চার করে ধর্মসংকট। দশরথ, রাম, রাবণ, ভরত, মারীচ, বিভীষণ, লক্ষ্মণ ও সীতার জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে এ সংকট দেখা দিয়েছে। কিন্তু সমগ্র কাব্যের কলেবরের অনুপাতে তার পরিমাণ কম। তীব্রতাও স্বল্পস্থায়ী, তাই চিত্তবিনোদনই অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। মহাভারতে এই অনুপাত ঠিক বিপরীত; মনোরঞ্জনের তুলনায় আপাত বিভ্রান্তি ও সংকটই প্রাধান্য পেয়েছে।

এই ঘটনাটি মহাভারতকে দুটি স্পষ্ট ভাগে খণ্ডিত করে দেয়; এর আগে কৌরবরা বহু অন্যায় করেছে ঠিকই, কিন্তু পাণ্ডবরা কৌশলে সেগুলি থেকে মুক্ত হয়েছেন। ধৃতরাষ্ট্র ন্যায়নীতি সম্বন্ধে দোলাচলচিত্ত ছিলেন, কখনও গান্ধারী, বিদুর বা কৃষ্ণের কথায় আত্মগ্লানি বোধ করেছেন, কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই কর্ণ শকুনি দুর্যোধনের মতে সায় দিয়েছেন।[২] কিন্তু প্রকাশ্য রাজসভায় রাজনন্দিনী, রাজকুলবধূ, পুত্রবধূর এই নির্যাতন, দুঃশাসনের প্রকাশ্য অন্যায্য আচরণ, দুর্যোধনের অসহ্য অপমানকর কটূক্তি, কর্ণের নীচ, অশালীন ইঙ্গিত, এই সব জেনেশুনেও সিংহাসনে স্থির ভাবে বসে থাকা, ন্যায়নীতিবোধের সমস্ত প্রেরণা উপেক্ষা করা, এর দ্বারাই ধৃতরাষ্ট্র এবং কৌরবরা পরম পাপিষ্ঠ ও অত্যাচারী বলে চিহ্নিত হয়ে গেলেন। অত্যাচারিত পাণ্ডবরা যুধিষ্ঠিরের প্রথম অন্যায় (পাশা খেলায় রাজি হওয়া) সত্ত্বেও, ছলনার দ্বারা সর্বস্বান্ত হয়ে অসহায় ভাবে স্ত্রীর লাঞ্ছনা দেখতে বাধ্য হওয়ায়, এবং প্রতিজ্ঞা অনুসারে সুদীর্ঘকালের জন্য বনে যেতে বাধ্য হওয়ায় সাধারণ শ্রোতাপাঠকের সহানুভূতি উদ্রেক করে। একা ধৃতরাষ্ট্র নন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ এঁরাও এই কলঙ্কে কলঙ্কিত হলেন। গান্ধারী, বিকর্ণ ও বিদুর বাদে কেউই মনুষ্যত্বের ন্যূনতম সাক্ষ্য রাখতে পারলেন না। অথচ ব্যাপারটা সত্যিই তো জটিল। যুধিষ্ঠির ধর্মপুত্র, তিনি জানতেন অক্ষক্রীড়া পাপ, তবু খেলেছেন। জানতেন, খেলায় তাঁর দক্ষতা নেই, জানতেন শকুনি শঠ ও চতুর প্রতিপক্ষ, কাজেই জয়ের সম্ভাবনা নেই, তবুও খেলেছেন। কাজেই এখানে শ্রোতা বা পাঠকের পক্ষে কৌরব-পাণ্ডব সম্বন্ধে পাপ-পুণ্য ভাল-মন্দ-ন্যায়-অন্যায় কোনও পক্ষ সুনিশ্চিত ভাবে স্থির করা যতটা কঠিন,

২. সভাপর্ব; (৬৮:১,২)

কোনও পক্ষে রায় দেওয়াও সেই কারণে ততটাই কঠিন। ঘটনা এখানে জটিল, জটিলতর নৈতিক মূল্যবোধের আপাত-বিপর্যাস। জনসাধারণ চায় ভালমন্দ সাদা-কালোর মতো সহজে বিভাজ্য হোক, তা হলে শ্রোতা বা পাঠকের সাড়া দেওয়াতে কোনও সমস্যা থাকে না। যেখানে তেমনটি হয় না, সেখানে পাঠকের দ্বিধা ও অস্বাচ্ছন্দ্য তার প্রতিক্রিয়াকে সংশয়িত করে তোলে। এমন সাহিত্য আর যাই হোক, সাধারণ ভাবে জনপ্রিয় হয় না।

এ ছাড়াও মহাভারতে পদে পদে নৈতিক মূল্যবোধে নানা সংঘাত ও সংঘর্ষ চোখে পড়ে। দুর্যোধন যখন পুরোচনের সাহায্যে গূঢ় ভাবে জতুগৃহ নির্মাণ করে পাণ্ডবদের সেখানে বাস করতে পাঠালেন তখন বিদুর কৌশলে যুধিষ্ঠিরকে এ খবরটি পাঠান। যে রাত্রে তাঁরা পালাবেন সে রাত্রে কুন্তী এক নিষাদী ও তাঁর পাঁচটি পুত্রকে নিমন্ত্রণ করে সুখাদ্যে ও সুরায় মত্ত অবস্থায় নিদ্রিত রেখে অগ্নিসংযোগের পূর্বেই পাঁচ পাণ্ডব পুত্রসহ পূর্বনির্মিত ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ দিয়ে নিরাপদ জায়গায় পালিয়ে যান।[৩] মহাকাব্যের পক্ষে পাণ্ডবদের বেঁচে থাকা দরকার, কারণ তারা দুর্বৃত্ত ও পাপিষ্ঠ কৌরবদের ধ্বংস করবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে। কিন্তু পাঠক কি কোনও মতে ভুলতে পারে কুন্তীর নিজের সন্তানদের বাঁচানোর এই অপকৌশলের ফলে নিরীহ ছ'টি নিষাদ প্রাণ দিতে বাধ্য হল?[৪] আবার দেখুন, সমাজে নিষাদের অবস্থিতি আর্যদের নিচে। কাজেই এখানে প্রাণের যে আপেক্ষিক মূল্যবোধ প্রতিফলিত একান্ত মানবিক নীতির নিরিখে তাকে মেনে নেওয়া কঠিন। নিষাদ নিচুস্তরের মানুষ, পাণ্ডবদের বাঁচাবার জন্যে ছলনার সাহায্যে যদি তাদের মরতে হয় তো ক্ষতি কী? ক্ষতি জাতিবর্ণবিভক্ত সমাজ হয়তো সহসা নির্ণয় করতে পারে না, কিন্তু অবচেতনের মনুষ্যত্ব নিশ্চয়ই বোঝে, সম্পূর্ণ নিরীহ মানুষ শুধু নিম্নবর্ণে জন্মানোর দাম দেবে উচ্চবর্গীয় মানুষকে প্রাণ দিয়ে বাঁচানোর জন্য— এটা ন্যায়নীতির সীমা লঙ্ঘন করে। আবারও দেখি, পরিস্থিতি এমন যে পাণ্ডবদের অগ্নিদাহে মৃত্যু থেকে বাঁচাতে গেলে এ ছাড়া পথও ছিল না। অথচ এ পথটি পঙ্কিল, অতএব নীতির দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য পথ নয়। সাধারণ পাঠক এখানে এই মুহূর্তে কী ভাবে সাড়া দেবে? মূল মহাকাব্যের তাৎপর্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে বলতে বাধ্য হবে কুন্তীর কৌশলটির বিকল্প ছিল না, অথচ সাধারণ মানুষের বিবেকেও একটি কাঁটা ফুটে থাকে: কাজটা সত্যিই ঠিক হল কি? এই কাঁটা রামায়ণের তিনটি ব্যাপারে— বালী-বধ, সীতাপরিত্যাগ ও শম্বুকবধেও বড় করেই ফোটে, অন্তত ফোটা উচিত। কিন্তু রামায়ণ তিনটি ক্ষেত্রেই নানা বাগ্‌জাল বিস্তার করে তখনকার সামাজিক মূল্যবোধকে সমর্থন করেছে: উনমানব বালীর বধ রামচন্দ্রের নিজের স্বার্থসিদ্ধির (সীতা উদ্ধারের) জন্যে, পরপুরুষস্পর্শে দুষ্ট নারী স্বামীর পক্ষে 'অভোগ্যা' বলে সীতাপরিত্যাগ ও ব্রাহ্মণপুত্রের প্রাণদানের জন্যে চণ্ডাল শম্বুকের অনিবার্য প্রাণহরণ। এতে রামায়ণ সরল হয়েছে; কিন্তু মহাভারতে পদে পদে দ্বন্দ্ব; জটিল তার পথ।

৩. আদিপর্ব: (১৩৬:৭-১৩)
৪. আদিপর্ব; (১৩৭:৭-৯)

মহাভারতের মহত্তম দ্বিধা

পূর্বের মতো একই ধরনেরই একটি প্রশ্ন মহাভারতে আছে, একলব্য উপাখ্যানে। আপাত দৃষ্টিতে এক চণ্ডাল লোকচক্ষুর অগোচরে মাটি দিয়ে দ্রোণাচার্যের মূর্তি গড়ে তাঁকে গুরুর আসনে বসিয়ে তাঁর সামনে ধনুর্বিদ্যা অভ্যাস করছিল। কাজটা ধর্ম-বিরুদ্ধ নয়, চণ্ডাল শিকার করে, ধনুর্বিদ্যায় জ্ঞান তার পক্ষে প্রয়োজনীয়। সে চণ্ডাল বলে ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য তাকে শিষ্য-রূপে স্বীকার করবেন না, কাজেই বেচারার গোপন উচ্চাকাঙ্ক্ষা (উচ্চমানের ধনুর্বিদ্যা আয়ত্ত করা) সফল করতে গেলে এ ছাড়া পথও ছিল না। বেশ চলছিল, যতক্ষণ না সে তার বিদ্যায় এমন উঁচুমানের শিক্ষার পরিচয় দিয়ে ফেলল যা অর্জুনেরও সাধ্যাতীত। অর্জুন দ্রোণাচার্যের কাছে নালিশ করতে দ্রোণাচার্য দেখলেন অর্জুনের মনস্কামনা পূর্ণ না হলে তাঁর নিজের প্রতিপক্ষ দ্রুপদের ওপরে প্রতিশোধ নেওয়া দুঃসাধ্য হবে, অতৃপ্ত অর্জুন তাঁর তৃপ্তিবিধান নাও করতে পারেন। তা ছাড়া একলব্য চণ্ডাল বৈ ত নয়, অতএব দ্রোণাচার্য ফতোয়া দিলেন, 'গুরুদক্ষিণা দাও ওই আঙুল ক'টি— যা দিয়ে ধনুকে জ্যা রোপণ করে, শরনিক্ষেপ করা যায়।' হাসিমুখেই দিলেন একলব্য এবং মহাকাব্য এর পর তাঁকে ভুলে গেল। এই উপাখ্যানও সহজ নয়, বহুমুখী এর সমস্যা: চণ্ডাল নিম্নবর্গের মানুষ, তার প্রাণের আপেক্ষিক মূল্য সামান্য; অর্জুন ধনুর্বিদ্যায় উন্নতমান লাভ করবেন, তাঁর কাছে দ্রোণের এই মর্মে প্রতিশ্রুতি ছিল। কার্যকালে তাঁকে দিয়ে ইষ্টসিদ্ধি করতে হবে, অতএব তাঁকে বিমুখ করা চলবে না, এ পর্যন্ত বেশ সহজ। কিন্তু ঘটনা তো এইটুকুই নয়। একটি অন্ত্যজ বালক নিভৃতে অন্যথা-দুষ্প্রাপ্য দ্রোণাচার্যকে গুরুর আসনে বসিয়ে সুদীর্ঘকাল নিষ্ঠা সহকারে এমন একাগ্র সাধনা করেছে যে তার কৃতির সামনে অর্জুন পরাঙ্মুখ, তাকে আপন প্রতিদ্বন্দ্বী বলে শঙ্কিত হন। এই দীর্ঘ দুরূহ গোপন সাধনার এমন অসামান্য সিদ্ধি, যেখানে দ্রোণাচার্যের কল্পিত পদতলে বসে সে অর্জন করেছে, সেখানে এই নৈপুণ্য, সাধনা, নিষ্ঠা, একান্ত আত্মবিলোপের কী মর্যাদা দিলেন উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণগুরু, ক্ষত্রিয় শিষ্য? গুরু দেখলেন শিষ্যের ক্ষোভ, শিষ্য দেখলেন দুর্জয় প্রতিদ্বন্দ্বী। অতএব, তার মর্মস্থানে আঘাত করে তার সাধনায় পূর্ণচ্ছেদ টানার জন্যে ওই ধনুঃসাধক আঙুল কটিই দক্ষিণা দিতে হল। আপাতস্তরে এ ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। কিন্তু কী নিষ্ঠুর, কী অমানবিক এ গুরুদক্ষিণা! এমন দক্ষিণা গুরুই বা নেন কেমন করে এবং তাঁর প্রিয়শিষ্য তাঁকে নিবারণ না করে সমর্থনই বা করে কী করে? কেমন করে একটি চণ্ডাল

বালকের স্বপ্ন-সাধ-সাধনা-দীর্ঘ তপস্যা পদদলিত করে অনায়াসে বিজয়ীর মতো সেখান থেকে নিষ্ক্রমণ করেন গুরু-শিষ্য, যেখানে রক্তাপ্লুত অঙ্গুলিহীন করতল মৃণ্ময় গুরুমূর্তির দিকে উদ্যত রেখে হতোদ্যম ব্যর্থ তরুণটি সমস্ত ব্যাপারটা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করে। চেষ্টা করে পাঠকও, এবং স্বস্তি পায় না, কারণ একটি মানুষের এমন সুন্দর এক স্বপ্নসাধনা, হোক না সে চণ্ডালের, সে তো দ্রোণকেই গুরু মেনেছিল! সেই দ্রোণের এক কৃতী শিষ্যের মনস্কামনা পূরণ করতে অজ্ঞাতপরিচয় একটি নিষাদের সুকঠোর সাধনার কঠিন সিদ্ধির মুহূর্তে তার ওপর নেমে এল আত্মবিলোপের নির্দেশ।

আবার দেখছি, কোনও ঘটনায় সাড়া দিতে গেলে প্রথমে তার বহুমুখী ব্যাপ্তি ও সম্ভাবনার মুখোমুখি আসতে হবে। উপলব্ধি করতে হবে এর সম্ভাব্য বিকল্প কী। না পেলেও আত্যন্তিক অর্থে ঘটনাটি যে হীন, মর্মান্তিক এবং আচার্য শিষ্য উভয়েরই সম্বন্ধে ঘৃণা জন্মিয়ে দেয়, এ প্রতিক্রিয়া পাঠক এড়াতে পারেন না। ফলে তার প্রতিক্রিয়া দ্বিধাবিভক্ত, কখনও বা বহুধা বিভক্ত হয়, তাই একটা অসন্তোষ একটা নৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্য থেকেই যায়।

মহাকাব্যের প্রথমাংশেই বেশ কিছু কাহিনি পাঠক শ্রোতাকে চিন্তায় ফেলে। শান্তনুর ছেলে দেবব্রত, গঙ্গার সঙ্গে তাঁর প্রথম বিবাহের সন্তান। জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসেবে সিংহাসনে তাঁরই অগ্রাধিকার। শান্তনু প্রেমে পড়লেন সত্যবতীর সঙ্গে, কিন্তু সত্যবতীর শর্ত তাঁর আপন সন্তান সিংহাসনে অধিকার পাবে। শান্তনু এত বড় অন্যায্যতাটাতে রাজি হতে পারছিলেন না, কিন্তু অচরিতার্থ প্রেমের তাপে দগ্ধ হচ্ছিলেন। বুঝতে পেরে দেবব্রত সত্যবতীকে আশ্বাস দিলেন সিংহাসনের অধিকার তিনি ত্যাগ করবেন। সত্যবতীর সংশয় ঘোচে না, যদি দেবব্রতর পুত্রের এ ঔদার্য না থাকে? তখন দেবব্রত প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি ব্রহ্মচর্য আচরণ করবেন। এ কঠোর ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্যে তাঁর নাম হল ভীষ্ম। দেবব্রত চিরকুমার থাকার উদার অঙ্গীকার তাঁকে মর্যাদা দিয়েছে, মহনীয় করে তুলেছে তাঁর পিতৃভক্তিকে। কিন্তু সম্পর্কটি তো একতরফা নয়। এ অঙ্গীকার গ্রহণ করার অর্থ: শান্তনু যে সুখের জন্য এত বড় ত্যাগ গ্রহণ করলেন, সেই গ্রহণের দ্বারাই তিনি আপন আত্মজকে প্রেমের ও দাম্পত্যের সুখ থেকে বঞ্চিত করলেন; বঞ্চিত করলেন বংশধর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বংশের ধারা সৃষ্টি করার সমাজে চিরস্বীকৃত অধিকার থেকে। শান্তনু সত্যবতীর বিবাহ হল;[১] কুরু পাণ্ডব, মহাভারতের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজবংশ এঁদেরই সন্ততি। চিত্রাঙ্গদ, বিচিত্রবীর্য দুই ছেলে। চিত্রাঙ্গদ দুরাচার, গন্ধর্বের সঙ্গে যুদ্ধ তিনি নিহত হন। বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে বিয়ে দিতে ভীষ্ম নিয়ে এলেন কাশীরাজের কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে, কিন্তু সন্তান জন্মের পূর্বেই তাঁরও মৃত্যু হল।

পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর এক পুত্র ছিল ব্যাস। ঘটনাচক্রে শান্তনুর দুই পুত্রেরই মৃত্যু হলে সিংহাসনে পুত্রের দাবি কায়েম করার জন্যে পূর্বে সত্যবতী একটি নিষ্ঠুর উপায় অবলম্বন করেছিলেন: দেবব্রতকে চিরকুমার ব্রত নিতে হয়েছিল। এত করেও কিন্তু তাঁর বা তাঁর

১. আদিপর্ব; (১২৩:৩৫)

স্বামীর কোনও পুত্র বা পুত্রদেরও কোনও সন্ততিরই সিংহাসনে অধিকার হল না। প্রথমে সত্যবতী যখন শান্তনু ও দেবব্রতর সঙ্গে সিংহাসনের অধিকার নিয়ে দরাদরি করেছিলেন, তখন সত্যবতীর প্রতি পাঠকের এক রকম সহানুভূতি উদ্যত হয়, ধীবর কন্যাকে রাজা ক্ষণভোগ্যার মতো গ্রহণ করে অল্প দিন পরেই ভুলে যেতে পারতেন, তাই এই শর্ত। কিন্তু পিতার প্রেমকে সার্থক করার জন্য ভাবী বিমাতার কাছে চিরকৌমার্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া, এটা এতই নিষ্ঠুর ও অমানবিক যে, এতে সাড়া দেওয়া পাঠকের পক্ষে কঠিন। নিরপরাধ দেবব্রতকে স্বাভাবিক জীবন থেকে চিরবঞ্চিত থাকতে হল। পিতার প্রেমোন্মাদকে চরিতার্থতা দিতে গিয়ে, প্রেমকে তিনি নিজের জীবনে জানতে পারলেন না। অর্থাৎ ঘটনাটির দুটি দিক আছে: সত্যবতীর স্বার্থের দিক, যার একাংশ শান্তনুরও স্বার্থের সঙ্গে অভিন্ন, আর অন্য একটা দিক হচ্ছে সত্যের প্রতি আনুগত্য; তাঁকে আমরণ কঠোর ব্রত মেনে নিতে হল এঁদের সুখবিধানের জন্য। পাঠক দ্বিধান্বিত বোধ করে প্রেমের সার্থকতা এবং নির্দোষ এক তরুণের আমরণ কৌমার্যের প্রতিজ্ঞার মধ্যে। যখন রাজমাতা হওয়ার জন্যে সত্যবতীর এই উদগ্র আকুতি পদে পদে ব্যর্থ হয়, এবং শান্তনুর সিংহাসনে বসে সত্যবতীর কানীন পুত্রের ঔরস জাত সন্তান, তখনও হয়তো পাঠক বিষণ্ণতার সঙ্গে একটা ন্যায়সঙ্গত বিধান দেখে খানিকটা আশ্বস্ত হয়। যা বলতে চাইছি তা হল: মহাভারতের ছোট বড় প্রায় কোনও উপাখ্যানেই পাঠকের প্রতিক্রিয়া সরল, একমাত্রিক নয়। এই বহুমাত্রিক সংবেদনই মহাভারতের বৈশিষ্ট্য।

সিংহাসন নিয়ে এই ধরনের আরও একটি উপাখ্যান শকুন্তলা-দুষ্যন্তর কথা। গল্পটি বিখ্যাত, কিন্তু সেখানেও দুষ্যন্তকে প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল, শকুন্তলার সন্তানই রাজা হবে। গান্ধর্ব মতে শকুন্তলাকে বিয়ে করবার পরই দুষ্যন্ত শকুন্তলার কথা সব ভুলে গেলেন। শকুন্তলা বালকপুত্র সর্বদমনকে নিয়ে রাজসভায় যেতে দুষ্যন্ত বালকের পিতৃত্ব, গান্ধর্ব বিবাহ সবই অস্বীকার করলেন। তখন শকুন্তলা কঠিন ভাষায় তীব্র অনুযোগ করলেন, বললেন, 'আমার দায়িত্ব নিতে হবে না। কিন্তু তোমার সন্তানকে তুমি যৌবরাজ্যে অভিষেক কর বা না কর ভরণপোষণের দায়িত্ব তোমার।' দুষ্যন্ত স্বীকার না করলেও দৈববাণী শকুন্তলার কথার সত্যতা প্রমাণ করল, দুষ্যন্ত পুত্র ও শকুন্তলাকে গ্রহণ করলেন।[২] এই পুত্রই বংশকর পুত্র, পরে এর নাম হয় ভরত, কুরু পাণ্ডব যার বংশের শাখাপ্রশাখা। এ উপাখ্যানেও এমন বস্তু আছে যাতে সাড়া দেওয়া কঠিন। গান্ধর্ব বিবাহের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন নয়, কিন্তু যে সময়ে মহাকাব্য সম্পূর্ণতা লাভ করছে সে সময়ে গান্ধর্ব-বিবাহ ক্রমশ অচল হয়ে আসছিল। তার পরে প্রকাশ্যে রাজসভায় এক নারী এমন এক পুরুষকে তার দায়িত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছে, ভর্ৎসনা করছে, যে-পুরুষ বিবাহ সম্বন্ধই অস্বীকার করছে। দৈববাণী অলৌকিক; সমাধান এল সে পথে; কিন্তু তার আগে পর্যন্ত এই স্বাধীনচেতা নারীর আচরণ শ্রোতা বা পাঠককে কতকটা বিভ্রান্ত করে। গোপন বিবাহে জাত এই সন্তান বংশকর পুত্র হয়ে উঠল, কিন্তু তার পূর্বে তাকে

২. আদিপর্ব: (৯৪:৮৮-৯০, ৯২)

উপলক্ষ্য করে তার জননী রাজাকে কটুকথা বলে যাচ্ছে অনর্গল, এটা বরদাস্ত করা হয়তো সহজ হয়নি সামাজের পক্ষে, কারণ ব্যাপারটায় কিছু জটিলতা আছে এবং জটিল ব্যাপারে সাড়া দেওয়া কঠিন। তাই তার জনপ্রিয়তা বড় একটা ঘটে না।

যে-বেদব্যাস মহাকাব্যের রচয়িতা তাঁর জন্মের ইতিবৃত্তেও একই রকম এক ঘটনা। নৌকা বাইত মেছুনির মেয়ে; পারানির সময়ে তাকে দেখে আকৃষ্ট হয়ে তাকে গ্রহণ করতে চাইলেন ঋষি পরাশর। না, বিবাহ নয়, কোনও দায়িত্ব নয়, শুধু ক্ষণ-সম্ভোগের আহ্বান। কৌমার্য ফিরে পাবে সে-মেয়ে, গায়ের যে গন্ধের জন্যে তার দুর্নাম 'মৎস্যগন্ধা' বলে', তা ঘুচে যাবে, সন্তান কৃতী হবে, ইত্যাদি বরে তাকে প্রলুব্ধ করলেন। জন্ম নিল কালো ছেলে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন।[৩] লক্ষণীয়, ঋষি পরাশর সত্যবতীকে সম্ভোগ করার জন্য তাকে কিছু কিছু বর দিলেন বটে কিন্তু তার সম্বন্ধে বা তার গর্ভজাত সন্তানটির সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র দায়িত্ব স্বীকার করলেন না। ঋষিত্বের একটা দিক উন্মোচিত হল। দ্বৈপায়ন, কেননা এক দ্বীপে তমিস্রার আবরণ সৃষ্টি করে মৎস্যগন্ধাকে গ্রহণ করেছিলেন ঋষি। কাজটা প্রচলিত অর্থে দুর্নীতির, অথচ সেই ছেলেই হল বেদব্যাস। মানতে মুশকিল থেকে যায়, মহাভারতের রচনার শেষ পর্বের পাঠকেরও, পরবর্তীদের তো বটেই। কিন্তু অকুণ্ঠ নিরাবরণ এই বর্ণনায় কোথাও দুর্নীতিকে সুনীতিতে পরিণত করার চেষ্টাও নেই। জনপ্রিয়তার পথে এতে এক ধরনের প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়: সমাজে যা ভ্রষ্টাচার, তারই ঋষি-আচরিত সংস্করণকে মেনে নিতে হবে আর এক মহর্ষির জন্মকথা বলে।

কুন্তি এক ঋষিকে সেবায় তুষ্ট করলে তিনি একটি মন্ত্র শিখিয়ে বর দেন, সে মন্ত্র উচ্চারণ করে, যে কোনও দেবতাকে আহ্বান করলে তিনি আসবেন। তরুণী কুন্তির কৌতূহলে এলেন সূর্য, তাঁর বরে কুন্তির পুত্র কর্ণের জন্ম। আক্ষরিক অর্থে এ কাহিনিকে বিশ্বাস করা যায় না। মূল কথাটা বোঝা যায়, কর্ণ প্রাসাদের বা প্রাসাদে অভ্যাগত কোনও ব্যক্তির জারজ সন্তান; কুন্তির কুমারী কন্যা অবস্থায় তাঁর জন্ম বলে কর্ণের শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা কানীন। কিন্তু কুন্তি তো কুমারী, কেমন করে স্বীকার করবেন কানীন এই পুত্রকে? ধাত্রীর সাহায্যে এক পেটিকায় শুইয়ে তাকে নদীর জলে ভাসিয়ে দিলেন।[৪] কোনওদিন কর্ণ ক্ষমা করেননি জন্মক্ষণেই জননীর এই মর্মান্তিক নিষ্ঠুরতা। অথচ কুমারী কুন্তি কোন ভরসায় সে পুত্রকে প্রকাশ্যে স্বীকার করে লালন করবেন? তিনি তো তখন জানতেন না যে যাঁর সঙ্গে পরে তাঁর বিবাহ হবে তিনি স্বয়ং প্ররোচনা দিয়ে তিনটি ক্ষেত্রজ সন্তানকে জন্ম দিতে বাধ্য করবেন কুন্তিকে। অতএব, কর্ণের জন্মক্ষণে যেহেতু কুন্তির সে আশ্বাস ছিল না, তাই তাঁর বিকল্প আচরণের সুযোগও ছিল না। ব্যাপারটা উভয়পক্ষেই মর্মন্তুদ, তাই কুন্তির আচরণের এবং কর্ণের ক্ষোভের বিচার করতে পারে না পাঠক। পারে না বলে দুঃখ পেলেও নৈতিকতা নিয়ে বিচলিত বোধ করে,

৩. আদিপর্ব; ৬৯:৩৭
৪. আদিপর্ব; ৫৭:৭১

আরও বেশি এই জন্যে যে, একদিন কুন্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কর্ণকে আত্মপরিচয় দিয়ে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করে পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করতে অনুনয় করেন। যথারীতি প্রত্যাখ্যাত হন কুন্তি, সূর্যপুত্র ক্ষুদ্র স্বার্থে দলত্যাগী হতে সম্মত হতে পারেন না।[৫] কিন্তু যে দ্বিধা অনুক্ষণ পাঠকের মনে অস্বস্তি আনে তা হল ঘটনাটির বহুমুখীনতা। জন্মক্ষণে পরিত্যাগও যেমন অনিবার্য ছিল, কর্ণকে পক্ষত্যাগ করতে অনুরোধ করাও তেমনই অনিবার্য। এ অনুরোধের পশ্চাতে শুধু কি অর্জুনের কল্যাণকামনা? চির-অতৃপ্ত যে মাতৃত্ব অপরিণত ভীরু কুমারীকে নিষ্ঠুর করে তুলেছিল তার প্রায়শ্চিত্তের কোনও বাসনাই কি এর মধ্যে নিহিত ছিল না? শত্রুপক্ষীয় পাণ্ডবদের জননী বলেই, অথবা হয়তো জন্মক্ষণে সন্তানপরিত্যাগিনী বলে কর্ণের পক্ষে সহজ হয়নি জননীকে সত্যকার পরিচয়ে মাতৃত্বের স্থান দেওয়া। তিনি তো জানতেন অধিরথ ও রাধা তাঁর পালক পিতামাতা মাত্র, কুন্তিপুত্র হওয়ার গৌরব ত্যাগ করলেন বৃহত্তর সত্যরক্ষার জন্যে, কিন্তু কাজটা সহজ হয়নি। তাই পাঠকের পক্ষেও সহজ হয়নি এ-ঘটনায় সংবেদন নিরূপণ করা। নৈতিক বিচার যেখানে যথার্থ ভাবে প্রযোজ্য হয় না, বিষয়টির অন্তর্নিহিত জটিলতার জন্যে, সেখানে তা শ্রোতা বা পাঠককে বাধ্য করে চিন্তা ও মননের দ্বারা একটি সমাধানের সৃষ্টি করতে এবং হয়তো এ সমাধানও সকলের এক রকম হয় না। ললাটে কুঞ্চনরেখা নিয়েও অকুণ্ঠিত প্রশংসা করে চিন্তাশীল পাঠক। বাকিরা দ্বিধার মধ্যে পড়ে এবং ব্যাপারটাকে এড়িয়ে গিয়ে সহজ সরল ঘটনা, বর্ণনার সন্ধান করে। জনতার প্রিয় নয় এমন বস্তু; জনতা অস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করে এর সুগভীর আবেদন, কিন্তু সেটা আবেগ ও মননের মিশ্র সংযোগে নির্মিত হয়, তাই যথার্থ বোদ্ধা ছাড়া এর মর্মে প্রবেশ করা কঠিন। তাই এ বস্তু আপন উৎকর্ষের মহিমায় আসীন থাকে, ব্যাপক ভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে না।

৫. আদিপর্ব; (১০৪:১৩)

মহাভারতে নৈতিক অভিঘাত

ছোটখাট উপাখ্যানের মতোই মহাভারতের কাহিনিতে বৃত্তের কেন্দ্রীয় উপজীব্যেও এবং কাহিনির তাৎপর্যে সাড়া দেওয়া, রামায়ণের সরলরৈখিক কাহিনিতে সাড়া দেওয়ার চেয়ে কঠিন। রামায়ণের কলেবর মহাভারতের এক-চতুর্থাংশ, এই কারণে রামায়ণে ঘটনার পারম্পর্য মনে রাখাও অনেক সহজ। মহাভারতের ঘটনার বিস্তৃতি ও জটিলতা, চরিত্রের সংখ্যা ও পরস্পরের সংঘাত— এ সবই এ-কাব্যের দুরূহতার কারণ। কিন্তু মূল দুরূহতা এর নৈতিক অভিঘাতে পাঠকের সাড়া দেওয়ার সমস্যায়। উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক ও স্ত্রী— এই ক'টি পর্বেই মূলত যুদ্ধকাণ্ড বিবৃত হয়েছে। উদ্যোগ পর্বে দু' পক্ষই কতকগুলি যুদ্ধের শর্ত স্বীকার করে নেন: শত্রুকে পিঠের দিকে আঘাত করা চলবে না; অধোনাভি আঘাত করা চলবে না; যে শত্রু ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম চাইছে বা কোনও কারণে সময় চাইছে তাকে সময় দিতে হবে— এমনকী প্রয়োজনে সাহায্যও করতে হবে। সূর্যাস্তের পরে যুদ্ধ করা যাবে না এবং নারী বা শিশুকে আঘাত করা অশাস্ত্রীয়।[১] এই সব শর্ত করার পরে দু'পক্ষের প্রস্তুতি— অস্ত্রশস্ত্র, সেনাপতি নিরূপণ, আগত রাজা ও সৈন্যদলের কর্তব্য নির্ধারণ, ব্যূহরচনা, যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে দু'পক্ষে গোপন মন্ত্রণা। তার পর যুদ্ধের নির্দিষ্ট দিনে উষাকালে কৌরবের অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য সমাবেশ। পাণ্ডবদের অনুগত রাজা, রাজন্য ও সৈন্যদলকে যুদ্ধের জন্যে ব্যূহবদ্ধ করা।

সব আয়োজন শেষ, এখন যুদ্ধ আরম্ভের সূচনা করবে যে-শঙ্খধ্বনিটি শুধু তারই প্রতীক্ষা। নাটকীয় প্রতীক্ষার মূহূর্তে। ঠিক সেই সময়ে দেখা গেল, জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির পাণ্ডব-শ্রেণি ছেড়ে ছুটে গিয়ে একে একে কৌরবপক্ষে দণ্ডায়মান বয়োবৃদ্ধ, যশোবৃদ্ধ আচার্য ও সেনাপতিদের পায়ে পড়ছেন, বলছেন, 'যেমন করে হোক, এই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ বন্ধ করুন। এ ঘটতে দেওয়া অন্যায়, আপনারা থামান এ যুদ্ধ।' কী বললেন কুরুপক্ষীয় যশস্বী, বর্ষীয়ান, তেজস্বী আচার্য ও সেনাপতিরা? 'অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্তর্থো ন কস্যচিৎ। ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ।।— পুরুষ অর্থের দাস: অর্থ কারও দাস নয়। আমরা

১. উদ্যোগপর্ব; (১৪৪:১১-১৪)

কৌরবদের কাছে অর্থের দ্বারা বদ্ধ, অতএব, ক্লীবের মত বলছি, যুদ্ধবিরতি ছাড়া আর কোনও প্রার্থনীয় থাকে তো বল।'[২]

এই নাটকীয় ঘটনায় প্রশ্ন ও উত্তর দুটিই এমন জটিল যে সহজে কোনও সাড়া জাগে না। কেন? ছুটে যাচ্ছেন কে? পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির, বিধিমতে কুরুরাজ্যের সিংহাসনে যাঁর জ্যেষ্ঠাধিকার। এর আগে পাঁচটি গ্রামের বিনিময়ে তাঁর হয়ে সে-অধিকার ছাড়তে প্রস্তুত ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে জানানো এবং দীন ভাবে আজ তাঁর এই শান্তিভিক্ষা, এ দুটোই তাঁর পক্ষে ধর্মত্যাগ। প্রাচীন ভারতবর্ষে ধর্মের দুটো সমাজস্বীকৃত সংজ্ঞা ছিল. বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্ম। বর্ণধর্মের নিরিখে ক্ষত্রিয় যুধিষ্ঠিরের কর্তব্য তাঁর ন্যায্য অধিকার আদায় করবার জন্যে এ যুদ্ধ করা। আশ্রমধর্মের নিরিখে তিনি গার্হস্থ্যাশ্রমে ছিলেন। সে আশ্রমে ধর্ম, অর্থ এবং কাম তাঁর লক্ষ্য এবং সাধনের বিষয়। এ দুই দিক থেকেই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির যা করলেন তা অধার্মিক। পাঠক শ্রোতা তাঁর মধ্যে ক্ষত্রিয়োচিত ও পুরুষোচিত দৃঢ়তার অভাব দেখে, এ ব্যাপারে অসহিষ্ণু বোধ করে। অতএব পাঠকের এ প্রতিক্রিয়া যথার্থই বিধিসঙ্গত।

তবে যুধিষ্ঠির এমন কাজ করলেন কেন? তিনি কাপুরুষ, অশাস্ত্রজ্ঞ বা মূর্খ তো ছিলেন না। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের যে আন্তর অশান্তি তাঁকে পাঁচটি গ্রামের বিনিময়ে কুরুসিংহাসনে অধিকার ত্যাগ করতে প্ররোচনা দিয়েছিল, সেই অশান্তি, অস্থৈর্য ও অনিশ্চিত-বোধই তাঁকে এ-কাজে প্রবৃত্ত করেছিল। স্বজনঘাতী যুদ্ধের বিনিময়ে কুরুসিংহাসনও তাঁর কাম্য মনে হয়নি, কারণ ক্ষত্রিয় ধর্মের চেয়েও তাঁকে অনুপ্রাণিত করছিল মানবধর্ম। যে কোনও কারণেই হোক, হিংসা, নরহত্যা, ভ্রাতৃ-রক্তপাত তাঁর কাছে নিতান্ত ঘৃণ্য ও গর্হিত মনে হচ্ছিল। আরও বেশি এই কারণে যে, এই মূল্যে সিংহাসনের অধিকার লাভ করার চেষ্টা তাঁর কাছে অমানবিক মনে হয়েছিল। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়কৃত্যের চেয়ে মানবধর্মকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন বলেই এত দীন ভাবে গুরুজনদের পায়ে পড়ে যুদ্ধ ও ভ্রাতৃহত্যা নিবারণ করবার চেষ্টা করলেন।

এটাই কিন্তু সাধারণ পাঠক বা শ্রোতার কাছে প্রত্যাশিত ছিল যে, তিনি শঙ্খধ্বনি শুনে ক্ষত্রিয়দর্পে অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধ শুরু করবেন, কেননা তাঁর পক্ষে এটি ধর্মযুদ্ধ। অতএব তাঁর আচরণ সমর্থন করা দূরে থাক, পাঠকের কাছে এটা ভীরু কাপুরুষতার মতোই ঠেকে; তাদের তিনি হতাশ করেন। আর মহারথী আচার্যরা কী বললেন? অমানবিক ভ্রাতৃঘাতী এই যুদ্ধ বন্ধ করবার কোনও সাধ্য তাঁদের নেই, কারণ তাঁরা কৌরবপক্ষের কাছে অর্থের দাস, অর্থ কারও দাস নয়। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যে মহারথীরা ভিন্ন ভিন্ন কারণে কৌরবপক্ষ সমর্থন ও আশ্রয় করেছেন, কৌরবরা অন্যায় যুদ্ধের প্রবর্তন করছেন জেনেও। এই সব আচার্য কৌরব, পাণ্ডব উভয় পক্ষেরই শ্রদ্ধেয়, গুরু বা গুরুকল্প। যুধিষ্ঠিরের মতোই সাধারণ পাঠকও তাঁদের কাছে জীবনের উন্নততর মূল্যবোধ প্রত্যাশা করে। কিন্তু বাস্তবে তাঁরা স্বীকার করলেন তাঁরা

২. ভীষ্মপর্ব: (১:২৯-৩২)

কৌরবদের অন্নদাস, অতএব, 'ক্লীবের মত কথা বলেছেন'। যুদ্ধ থামাবার নৈতিক অধিকার তাঁরা খুইয়ে বসে আছেন— অর্থের জন্যে কৌরবদের আশ্রয় গ্রহণ করে। আজ তাঁরা ন্যায়-অন্যায় যথাযথ ভাবে বুঝেও অন্ন-ঋণ অস্বীকার করতে পারেন না। বিদ্যায় জ্ঞানে সমৃদ্ধ এই আচার্যরা জীবনে মহৎ আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে অন্যায় পক্ষে থেকে অগৌরবের মৃত্যু বরণ করলেন। এর করুণ দিকটি শ্রোতাদের স্পর্শ করে; সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধের বহুমুখীনতার সামনে এসে হতবাক বোধ করেন তাঁরা। এ কেমন আচার্য? মাথা উঁচু করে যাঁদের দিকে তাকানোর কথা, তাঁদের উক্তিতে কী অপরিসীম দৈন্য। ন্যায়নীতি, আত্মমর্যাদাবোধ আচার্য-পদের গরিমা সবই ধূলিলুণ্ঠিত হল, একদিন অর্থের জন্যে কৌরবপক্ষ অবলম্বন করেছিলেন বলে। স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে ভুল সিদ্ধান্ত নিলে কী মর্মান্তিক দুঃখেই না সে ভুলের মূল্য শোধ করতে হয়। শ্রদ্ধেয় আচার্যদের মুখে এই অশ্রদ্ধেয় স্বীকারোক্তি পাঠককে নৈতিক মূল্যবোধের সংঘর্ষের মুখোমুখি নিয়ে আসে: আচার্য বলে শ্রদ্ধা করবে, না, স্বার্থবুদ্ধিতে মনুষ্যত্বের মর্যাদা বিকিয়ে দিয়ে তাঁরা আজ 'ক্লীবের মত কথা বলছেন' বলে ঘৃণা করবে? যুগপৎ দুটোই অর্থবহ এবং সে কারণে পাঠকের প্রতিক্রিয়া দ্বিধান্বিত ও সংশয়াকুল হয়ে ওঠে।

যুদ্ধ শুরু হতে চলেছে, এমন সময়ে অর্জুন বেঁকে বসলেন: স্বজনের রক্তের পথ বেয়ে তিনি সিংহাসনের অধিকার চান না। এখানেও ক্ষত্রিয় বর্ণধর্ম এবং তারও ওপরে যার স্থান নেই মানবধর্মের সংঘাত।[৩] এ দুটি ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মূল্যবোধকে প্রতিহত, পরাস্ত করছে মহাভারতের ও কিছু পূর্বকালের বৌদ্ধ মূল্যবোধের অহিংসা-নীতি। ব্রাহ্মণ্য মূল্যবোধেও অহিংসা পরম ধর্মরূপে বহুবার উচ্চারিত হয়েছে সত্য, কিন্তু যেখানে বৈদিক ধর্মাচরণে পশুবধ আবশ্যিক, সেখানে হিংসা ত ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গরূপেই থেকে গেছে। এর উর্ধ্বে কোনও বিশুদ্ধ মানবিক মৈত্রী, সর্বজীবে দয়া ও অহিংসার নীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়েই বর্ণধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন কি যুধিষ্ঠির ও অর্জুন? খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম ষষ্ঠ শতক থেকে জৈন-বৌদ্ধ-আজীবিক ও অমনই বিস্তর বেদপ্রতিবাদী প্রস্থানের প্রভাবে আর্যাবর্তে যে নতুন বাতাস বইছিল, তার মধ্যে অহিংসা প্রবল ভাবে দেখা দেয়। মহাভারত রচনা শুরু হয় সেই সময় যখন এই অহিংসাবাদ বৈদিক ধর্মাচরণকে অস্বীকার করছে যখন; মানবমৈত্রী ও করুণা বিকল্প ধর্মাচরণে দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছে। কাজেই তখনকার মহাকাব্যের নায়ক হিংসাকে বর্জন করে উর্ধ্বতন এক আদর্শকে বরণ করবেন, এটা প্রত্যাশিতই ছিল। পাঠক ও শ্রোতা কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত বোধ করেন, কারণ বর্ণধর্ম তো সমাজ-অনুমোদিত ধর্ম এবং সেই কারণে অবশ্য-পালনীয়। ক্ষত্রিয় যখন স্বধর্ম পালন করতে পরাঙ্মুখ হল, তখন ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ও বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের কাছে প্রত্যাশিত আচরণ না পেয়ে পাঠকের চিরাভ্যস্ত হিসেবে গোলমাল হয়ে যায়। এবং তখন এ কাব্যে সাড়া দেওয়ার জন্যে পাঠককে নতুন করে, স্বতন্ত্র ভাবে ভাবতে হয়। এই

---

৩. ভীষ্মপর্ব; (৪১:৩৬-৭, ৫১-২, ৬৬-৭, ৭৭-৮)

ভাবে ভাবতে বাধ্য করে যে কাব্য, তা নিয়ে পাঠকের স্বস্তি থাকে না। রামায়ণ দু-একটি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া তাকে ভাবায় না; বরং গল্প বলে, প্রচলিত মূল্যবোধগুলিই পুনর্বার পরিবেশন করে, মনোরম বর্ণনায় তাকে মুগ্ধ করে। যা সে জীবনের ধ্রুব সত্য বলে বিশ্বাস করে এসেছে পারিবারিক সম্পর্কগুলি সম্বন্ধে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে, তাকেই সে পাচ্ছে বারে বারে নতুন নতুন উপাখ্যানের পরিবেশে। কোথাও ধাক্কা লাগছে না, বরং তার অভ্যস্ত বিশ্বাসভূমির ওপরে দাঁড়িয়েই নবতর ভূমিকায় সে-বিশ্বাসের সমর্থন পেয়ে সে দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধরতে পারছে তার পুরনো অভ্যস্ত বিশ্বাসগুলিকে। এতে আছে স্বস্তি, যার থেকে আসে কাব্যের জনপ্রিয়তা।

অর্জুনের প্রশ্ন ছিল সারথি কৃষ্ণের কাছে: যাদের জন্যে লোকে বেঁচে থাকতে চায়, সেই অতিপ্রিয় আত্মীয়দেরই হত্যা করে, যে-বিজয়, যে-কীর্তি, যে-রাজ্য, তা আমি চাই না। মূলত এটা যুধিষ্ঠিরের বিবেকদংশনেরই নতুন এক উচ্চারণ। কোনও আচার্যের কাছে নয়, স্বয়ং কৃষ্ণের কাছে। যুধিষ্ঠিরকে কৃপ, দ্রোণ, ভীষ্মরা যা বলেছিলেন তার মধ্যে ছিল ব্যক্তিগত আত্মগ্লানি, মূল্যবোধের প্রতারণা। কৃষ্ণ অর্জুনকে যা বললেন তা সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুর:

> তুমি যাদের মারবে তাদের কর্ম তাদের আগেই মেরে রেখেছে, তুমি নিমিত্তমাত্র হও, সব্যসাচী। এ তো সত্য যে, 'জন্মিলে মরিতে হবে'। তা ছাড়া, কেউই ত আসলে মরে না, শস্যের মতো ক্ষণিক মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আবার উজ্জীবিত হয়। এদের তো তুমি কোনও ফল লাভের আশায় মারছ না; নিষ্কাম ভাবে ফলপ্রত্যাশা ত্যাগ করে তোমার ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম তুমি কর।

এ ছাড়াও দীর্ঘক্ষণ ধরে কৃষ্ণ অর্জুনকে নানা দার্শনিক যুক্তি দিলেন— প্রক্ষিপ্ত অংশে এর দৈর্ঘ্য আঠারো অধ্যায়। সত্যকার যুদ্ধের প্রাক্কালে দু'পক্ষ একক কৃষ্ণের উপদেশ অতক্ষণ ধৈর্য ধরে শুনেছিল এটা অবাস্তব। যাই হোক, কিছু অংশও যদি বলে থাকেন ওই মর্মে, তা হলে তার প্রত্যেকটারই উত্তর ছিল: শত্রুর কর্মই যদি তাকে আগে থেকে মেরে রেখে থাকে, তা হলে অর্জুন তাকে পুনর্বার হত্যা কেন করবেন? বিশেষত, তার এবং শত্রুর কাছে যখন এটা বাস্তব মৃত্যুরই রূপ নেবে। স্বজনহত্যার মতো এমন নিষ্ঠুর কর্মে 'নিমিত্ত'ই বা হবেন কেন? শস্যের মতো শত্রু যদি পুনর্জাত হয়, সে তার নির্দিষ্ট পরমায়ুর শেষে শয্যায় প্রাণত্যাগ করুক না কেন? যুদ্ধে অস্ত্রাঘাতে তাকে হনন করা কেন? সবচেয়ে বড় কথা, যুদ্ধটা তো মোটেই নিষ্কাম নয়— সিংহাসনটা কৌরবরা পাবে না পাণ্ডবরা, লড়াই তাই নিয়েই; অতএব উভয়তই এটা সকাম। অর্জুন মনের মধ্যে নিষ্কাম হলে তো এ যুদ্ধ থেকে তাঁর সরে থাকাই উচিত, যেমন ছিলেন বলরাম। এ ছাড়া আরও অনেক যুক্তিগত, তত্ত্বগত ফাঁক আছে, তার আলোচনা অন্যত্র করেছি।[৪] এখানে লক্ষ্য করতে হবে, পাঠকের প্রতিক্রিয়া: অর্জুনের অত্যন্ত

৪. আমার 'গীতা নিয়ে প্রশ্ন' রচনা দ্রষ্টব্য

মর্মান্তিক যুক্তি ও মানবিক জুগুপ্সাতে সকলে সাড়া দিতে পারে; আবার জুগুপ্সা ক্ষত্রিয়োচিত নয় বলে পাঠকের মনে এতেও দ্বিধার উদয় হয়। গীতায় অর্জুন শ্রোতা, কিন্তু তাঁর দ্বিধার শেষ নিরসনটা কৃষ্ণ যুক্তি দিয়ে করতে পারেননি, অধ্যায়ের পর অধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন দর্শন প্রস্থান উপস্থাপিত করেও বুঝলেন, অর্জুনের প্রথম আত্যন্তিক ব্যাকুলতা ঘোচেনি। তখন কৃষ্ণ জাদুর অবতারণা করলেন। অর্জুন দেখতে পেলেন কৃষ্ণ তাঁর বিশ্বজাগতিক রূপে প্রকাশিত।[৫] এ অংশটা অতিলৌকিক; বর্ণনা যতই চিত্তগ্রাহী হোক না কেন, এটার সাহিত্যিক চরিত্র কিন্তু রূপকথাধর্মী এবং সাধারণ পাঠকের সাধারণ দ্বিধাসংশয় এতে উড়িয়েই দেওয়া হল। ক্ষত্রিয়ের বর্ণধর্ম অনুসারে আচরণ করতে যিনি বলছেন তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ; যুক্তিতে যতই ফাঁক থাক, বক্তাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। কাজেই অর্জুন যুক্তির উত্তরে পেলেন জাদু এবং স্তম্ভিত হয়ে কৃষ্ণের বশ্যতা স্বীকার করলেন। পাঠক ভেবে দেখে না যুক্তির স্তরে প্রতিযুক্তি কতটা নিশ্ছিদ্র। নির্বাক বিস্ময়ে জাদুতে বিমূঢ় হয়ে উদ্যত সংশয়কে নিরস্ত করে। এই কৌশল রামায়ণেও বারবার দেখেছি: লৌকিক সংকটের সমাধান অতিলৌকিকে। সেখানেই রূপকথাধর্মী রামায়ণের জনপ্রিয়তার একটি সূত্র; গীতার জনপ্রিয়তারও, অন্তত এর শেষাংশের।

৫. ভীষ্মপর্ব; (৩৩:৯)

ভীষ্ম: চিন্তার সংঘাত

আঠারো দিনের যুদ্ধের প্রথম দশ দিনের সেনাপতি ভীষ্ম। বয়সে প্রৌঢ়ত্ব ছাড়িয়ে বার্ধক্যে পৌঁছেছেন, আশির ওপরে বয়স, কিন্তু সেনাপতির ভূমিকায় যুদ্ধ করছেন তরুণের মতো।[১] দিনের পর দিন পাণ্ডব কৌরব দু'পক্ষে প্রচুর লোকক্ষয় হচ্ছে, নিপুণ সেনাপতির যুদ্ধকুশলতায় কৌরবদের পরাজয়ের লক্ষণ নেই, জয়েরও না। পাণ্ডবরা, বিশেষ করে যুধিষ্ঠির, কোনও কিনারা দেখতে পাচ্ছেন না; বিপর্যস্ত বোধ করা ছাড়া। শেষ পর্যন্ত তাঁরা একদিন যুদ্ধ শেষে ভীষ্মেরই দ্বারস্থ হলেন। তাঁরা তো জানতেন যে পিতাকে সুখী করবার জন্য তিনি চিরকৌমার্য স্বীকার করবার পরে পিতা তাঁকে ইচ্ছামৃত্যুর বর দিয়েছিলেন; কাজেই ভীষ্ম নিজে মৃত্যুবরণ করতে না চাইলে, নেই তাঁকে বধ করার আর কোনও পথই। তা ছাড়া যুধিষ্ঠিরকে তিনি কথা দিয়েছিলেন যে, কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করলেও পাণ্ডবদের মঙ্গলের জন্য তিনি পরামর্শ দেবেন। কাজেই পরামর্শ চাইতে গেলে তিনি বললেন, এ রকম ক্রমাগত লোকক্ষয়ে তিনিও ক্লান্ত ও বিচলিত। এমনিতে যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত করবার সাধ্য কারওরই নেই। কিন্তু, তিনি যুদ্ধে বিমুখ, রুগ্ন, ভীষণ ভাবে আহত, নিরস্ত্র সৈন্য বা নারীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন না— এ তাঁর দীর্ঘকালের সংকল্প। পাণ্ডবদের চেষ্টা হবে যাতে তিনি অস্ত্র ত্যাগ করেন, যাতে অর্জুন অনায়াসেই তাঁকে পরাজিত করতে পারবেন।

দীর্ঘকাল পূর্বে যখন ভীষ্ম বিচিত্রবীর্যের জন্য বধূসংগ্রহ করতে গিয়ে কাশীর তিন রাজকন্যা অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকাকে হরণ করে আনেন, তখন অম্বা তাঁকে জানান যে তিনি মনে মনে শাল্বরাজের বাগদত্তা। শুনে ভীষ্ম নিজে তাঁকে শাল্বরাজের কাছে দিয়ে আসেন। কিন্তু অম্বা পরপুরুষের জন্যে নীত হয়েছিলেন বলে, শাল্বরাজ তাঁকে গ্রহণ করলেন না। এই প্রত্যাখ্যান অপমানিত, ক্রুদ্ধ, নিষ্প্রতিকার এই অবস্থার জন্য ভীষ্মকেই দায়ী করে অম্বা তপস্যায় দেহত্যাগ করলেন; সংকল্প নিলেন, তিনি যেন জন্মান্তরে ভীষ্মের মৃত্যুর নিমিত্ত হন। বিদর্ভরাজ পুত্রের জন্য সাধনা করলে অম্বা কন্যা হয়ে তাঁর ঘরে জন্মালেন, যদিও শিব বলেছিলেন পরে এ কন্যা পুত্রত্ব লাভ করবেন। পরে তিনি স্থূণাকর্ণ যক্ষের পুরুষত্ব লাভ করেন, বিনিময়ে সেই যক্ষ নারীত্ব প্রাপ্ত হয়।[২] সেই অম্বাই বিদর্ভরাজকন্যা শিখণ্ডী, আপাতত ধার করা পুরুষত্বে

১. ভীষ্মপর্ব (১১১:১); দ্রোণপর্ব (১:৩৩)

২. 'অর্জুনস্য ইমে বাণাঃ শিখণ্ডিন'; ভীষ্মপর্ব (৬৮:৩০)

পুরুষ। কিন্তু ভীষ্ম তো জানেন বাস্তবিকপক্ষে শিখণ্ডী নারীই, কাজেই পূর্ব সংকল্প অনুসারে তার বিরুদ্ধে ভীষ্ম অস্ত্রধারণ করবেন না। এখন অর্জুন যদি তাঁর রথের সামনের দিকে শিখণ্ডীকে বসিয়ে যুদ্ধ করেন তা হলে তাঁর অস্ত্র ভীষ্মকে স্পর্শ করবে। কিন্তু সামনে শিখণ্ডী থাকায় ভীষ্ম নারীবধের আশঙ্কায় অস্ত্রমোচন করতে পারবেন না। এই ভাবেই, একমাত্র এই ভাবেই, পাণ্ডবরা ভীষ্মকে পরাস্ত করতে পারবেন; অন্যথা ভীষ্ম নিজে এত শক্তিমান, সুশিক্ষিত, অভিজ্ঞ যোদ্ধা যে, সম্মুখ সমরে তাঁকে পরাজিত করবার সাধ্য আর কোনও বীরেরই নেই।

পরদিন তাই হল; অর্জুন শিখণ্ডীকে রথের সামনের দিকে বসিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। শিখণ্ডী তখন পুরুষ, যোদ্ধাও, তিনি শরনিক্ষেপ করছেন ভীষ্মের বিরুদ্ধে। তাঁর সমস্ত ক্ষোভ, গ্লানি, অপমান মোচনের সুযোগ এসেছে— ভীষ্মকে বধ করে এ বার সে সবের প্রতিশোধ নিতে পারবেন। তাঁর থেকে অর্জুনের বাণ নিক্ষেপের পার্থক্য ভীষ্ম ভাল করেই বুঝতে পারছেন, বলছেন এ বাণ শিখণ্ডীর নয়, অর্জুনের। কিন্তু যুদ্ধ করতে গেলেই শিখণ্ডী আহত হবে আর ভীষ্ম জানেন শিখণ্ডী প্রকৃতপক্ষে অর্থাৎ জন্মসূত্রে নারী, তাই তিনি অস্ত্রসংবরণ করলেন। তার পরের যুদ্ধটা একতরফা। শিখণ্ডী যথাসাধ্য অস্ত্রমোচন করছেন, কিন্তু অর্জুন যথার্থ সুশিক্ষিত নৈপুণ্যে মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করছেন। মহাভারত বলছে: গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহের পর যে দিন প্রথম বৃষ্টি নামে, মানুষ যেমন বাইরে বেরিয়ে শরীর পেতে দিয়ে সে বৃষ্টিধারা গ্রহণ করে তেমনই করে ভীষ্ম সারা শরীরে অর্জুনের বাণ-বর্ষণ গ্রহণ করতে লাগলেন। এক সময়ে জরা, ক্লান্তি ও অজস্র তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ হওয়ার দরুণ রক্তপাতে ও যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে ভীষ্ম রথ থেকে পড়ে গেলেন। নিপুণ ধনুর্ধর অর্জুন সুকৌশলে বাণে বাণে তাঁর জন্য একটা শরশয্যা নির্মাণ করলেন। ভীষ্মের দেহ ভূমি স্পর্শ করল না, ওই শরশয্যায় শায়িত রইল দীর্ঘকাল, পরে তাঁর অভীষ্ট তিথিতে তিনি স্বেচ্ছামৃত্যুর বরে মৃত্যুবরণ করলেন।

এ পর্যন্ত কাহিনি। এর জটিল গ্রন্থনার মধ্যে কয়েকটি দিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভীষ্মের স্বেচ্ছামৃত্যু-বরের সুযোগ না নিতে পারলে ভীষ্মের সেনাপতিত্বে যুদ্ধ অনির্দিষ্টকাল চলত, যে পর্যন্ত না অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ও পুরো পাণ্ডব সৈন্যদল নিশ্চিহ্ন হত। যুদ্ধে সেনাপতির ভূমিকায় থেকে ভীষ্ম যত ক্লান্তই হোন না কেন, এমনিতে স্বেচ্ছামৃত্যু-বরের সুযোগ নিতে পারতেন না— ক্ষত্রিয়ধর্মে এবং সেনাপতিধর্মে বাধত। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে অস্ত্রত্যাগ করার কথাই ওঠে না। তাঁর প্রতিজ্ঞা, স্ত্রী-বধ করবেন না, তাই অর্জুন রথের পুরোভাগে এক নারীকে স্থাপন করলে তবেই ভীষ্ম অস্ত্রত্যাগ করবেন। রথে শিখণ্ডীকে বসবার বুদ্ধিটা ভীষ্মই দিয়েছিলেন এবং তাঁর পরামর্শ যথার্থই কার্যকর হল।

মুশকিল থেকে যায় অনেক। শিখণ্ডী যখন স্থূণাকর্ণের পুরুষত্ব ধার করলেন তখন তিনি প্রকৃত প্রস্তাবেই পুরুষ হলেন; প্রমাণ, স্থূণাকর্ণ নারীতে পরিণত হল এবং সে বেচারি এ লজ্জায় মনিব কুবেরের সামনে বেরোতেই পারেনি। কাজেই রথারূঢ় শিখণ্ডী পুরুষই, এবং জন্মক্ষণে তার নারীত্ব যতটা সত্য ছিল, যুদ্ধক্ষণে অর্জুনের রথে তাঁর পুরুষধর্ম ঠিক ততটাই সত্য। কাজেই ভীষ্মের পক্ষে তাঁকে নারী ধরে নিয়ে স্ত্রীবধের ভয়ে অস্ত্র ত্যাগ করার মধ্যে

গোলমাল থেকেই গেল। শিখণ্ডী যে পরে পুরুষ হবে, দেবতার এ বর সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতেন বলেই শিখণ্ডীর পিতা এক নারীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিয়েছিলেন, কারণ দেবতার বর মিথ্যা হওয়ার নয়। কাজেই যখন শিখণ্ডী পুরুষ হলেন তখন তাঁর সে পুরুষতা যথার্থই; তাকে সন্দেহ করলে দেবতার প্রতিশ্রুতি মিথ্যা হয়ে যায়। ভীষ্ম যখন শিখণ্ডীর জন্মবৃত্তান্ত, তপস্যা, বরলাভ পুরুষ হওয়া এত সবই জানতেন তখন অর্জুনের রথে আসীন শিখণ্ডী যে দেবতার বরেই আজ প্রকৃত প্রস্তাবে পুরুষ, এটাও তাঁর জানার কথা। কাজেই সেই সময়কার পুরুষ শিখণ্ডীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেও তাঁর পূর্ব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হত না। তা ছাড়া এ ব্যাপারটা অর্জুনের বীরখ্যাতিকেও স্পর্শ করল, প্রায় লুকোচুরি ও প্রতারণার দ্বারা তিনি প্রতিপক্ষকে অস্ত্রত্যাগ করিয়ে তবে তাঁকে পরাস্ত করতে পারলেন। অর্জুনের শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর খ্যাতিতে এ কলঙ্ক লেগে রইল। যে-অর্জুনকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী অপরাজেয় ধনুর্ধর খ্যাতিতে অচল রাখবার জন্য একদা নিরপরাধ একলব্যকে মর্মান্তিক গুরুদক্ষিণা দিতে হয়েছিল, সেই অর্জুন আজ আত্মগোপন করে প্রতিপক্ষকে অস্ত্রত্যাগ করাতে সম্মত হলেন। এতে বীরের কর্ম— শত্রুজয়— সিদ্ধ হল বটে, কিন্তু বীরের ধর্ম?

শিখণ্ডী চেয়েছিলেন ভীষ্ম-বধ তিনিই করবেন। নিমিত্ত হয়ে তিনি সে উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারলেন বটে, কিন্তু এতে পুরুষ শিখণ্ডীর মর্যাদা হয়তো পুরো বাঁচল না। রথের সামনে বসাটা এমনই এক নিষ্ক্রিয় ভূমিকা, যাতে অত প্রবল বিক্ষোভ, অপমান, গ্লানির সঙ্গে সামঞ্জস্য হয়তো রইল না। শিখণ্ডীর সংকল্প সিদ্ধ হল, কিন্তু সে-ও যেন এক চোরা পথে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে প্রশ্নটি থেকে যায় তা হল, এই সমস্ত ব্যাপারটা ঘটতে পারল শুধুমাত্র এই কারণেই যে, একদা শাল্বরাজের প্রতি আসক্ত অম্বাকে ভীষ্ম হরণ করেছিলেন সৎ-ভাই বিচিত্রবীর্যের বধূ হওয়ার জন্য। অম্বিকা অম্বালিকাকে নিয়ে কোনও গোলমাল ছিল না। ভীষ্ম কেমন করে জানবেন, অম্বা মনে মনে বাগদত্তা? এবং, যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়ার পর কাপুরুষ শাল্বরাজ যে বাগদত্তা কন্যাকে প্রত্যাখ্যান করবেন সেটাই বা তিনি জানবেন কী করে? এই ব্যাপারে ভীষ্ম সম্পূর্ণ নির্দোষ। রাজকন্যাদের হরণ করার পূর্বে তাঁর কী করে মনে আসবে এদের কেউ অন্যের প্রতি আসক্ত? যখনই জানতে পারলেন তখনই নিজে অম্বাকে সঙ্গে নিয়ে শাল্বরাজের কাছে পৌঁছে দিলেন। অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বীরের ধর্মে যা করণীয় তাই করলেন। শাল্বরাজের কাপুরুষোচিত অমানবিক প্রত্যাখ্যানই অম্বার জীবনে ব্যর্থতার কারণ; এ অপমানের প্রতিবাদের ক্রোধটা বর্ষিত হওয়া উচিত ছিল তারই ওপরে। তা না হয়ে সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ল ভীষ্মের ওপরে। এত তার তীব্রতা যে, এখান থেকে গৃহীত হল ভীষ্মের প্রাণহানির শপথ, তার জন্য সাধনা ও পরে তার সিদ্ধিতে জ্বালার উপশম।

মহাভারতের পাঠক শ্রোতার এই অংশে কী রকম প্রতিক্রিয়া হওয়া সম্ভব? অম্বা লাঞ্ছিত, কিন্তু তার দায়িত্ব তো তার পূর্বরাগের আধার শাল্বরাজের। অথচ ভীষ্মকে বধ করার কঠোর সংকল্প, নিজের পুরুষবেশী নারী-জীবনে অপর এক নারীর সঙ্গে বিবাহ প্রহসন, তারই পরিণতিতে পিতৃরাজ্য আক্রান্ত হওয়া, বনে গিয়ে স্থূর্ণাকর্ণের সঙ্গে লিঙ্গ বিনিময়, পরে অর্জুনের

রথারূঢ় হয়ে শুধু মাত্র নিমিত্তরূপে ভীষ্মের ওপরে সেই তীব্র ক্রোধের উদ্‌গীরণ— পাঠক এর পৌর্বাপর্য ও অমোঘ ঘটনাগতি বুঝলেও তার বিবেক কি সায় দেয় এ সমস্ত ব্যাপারটায়? মনে কি হয় ভীষ্ম, অর্জুন, অম্বা-শিখণ্ডীর আচরণ অমোঘ এবং যথার্থ? ভীষ্ম অবধ্য, অজেয়, স্বেচ্ছামৃত্যু-বরপ্রাপ্ত, সেই ভীষ্মকে পরাজিত ও বধ করার জন্য দু-জন্মে অম্বার প্রচেষ্টা, অর্জুনের একটা স্পষ্ট প্রতারণায় লিপ্ত হয়ে— হোক না তা ভীষ্মেরই পরামর্শে— ক্ষাত্রধর্ম ও বীরোচিত আচরণের নীতি থেকে ভ্রষ্ট হওয়া, এটা তো রয়ে গেল। এবং যে ছলনাটুকু স্বয়ং ভীষ্মই বলে দিয়েছিলেন তার মধ্যে যে ফাঁকটা, অর্থাৎ অর্জুনের রথারূঢ় পুরুষটিতে তার পূর্বজন্মের নারীত্ব আরোপ করে স্ত্রীবধের আশঙ্কায় ভীষ্মের অস্ত্রত্যাগ, এটা পাঠক কী ভাবে নেবে? তার প্রতিক্রিয়া সংশয়িত হতে বাধ্য। নির্দোষ অম্বার লাঞ্ছনা যেমন সত্য ও মর্মান্তিক, তেমনই নির্দোষ ভীষ্মের মিথ্যা নারীবধের আশঙ্কায় মৃত্যুবরণও সমান হৃদয়বিদারক। শাল্বরাজ মহাভারতে অপরিচিত-প্রায়; সে দোষী, কিন্তু কোনও শাস্তি পেল না; নিদারুণ শাস্তি দিল শুধু অম্বাকে— এটিও পাঠককে পীড়িত করে। অর্জুন আড়ালে থেকে যুদ্ধ করে প্রতিপক্ষকে প্রথমে পরাস্ত ও পরে নিহত করার ব্যবস্থা করলেন— এটিও ক্ষত্রিয়ের অনুচিত, সে অস্বস্তিও থেকে যায়, যেমন আড়াল থেকে রামের বালিবধের ব্যবস্থা। রামায়ণ ওই ঘটনাটায় স্বস্তিবোধ করেনি। মহাকাব্যের নায়কের এ আচরণকে উপলক্ষ্য করে বিস্তর বাদানুবাদের অবতারণা করেছে। এখানেও সেই দ্বিধা থাকে। পাঠকের সহানুভূতি, সমর্থন সরলরেখার কোনও পথ খুঁজে পায় না— বারে বারে সামনে প্রতিকূল নৈতিকতায় নানা ভাবে ব্যাহত হয়। রামায়ণের মতো জনপ্রিয়তা যে মহাভারতের সে ভাবে হল না, তার কারণ এই ধরনের বহুধা-প্রবাহিত সংবেদনের আঘাতে পাঠক বিমূঢ় বোধ করে; তার প্রতিক্রিয়া আবেগ বা নৈতিকতার কোনও সোজা পথ খুঁজে পায় না। এ ব্যাপারে আরও একটা গুরুত্বের দিক হল, ভীষ্ম প্রথম ও প্রধান সেনাপতি; দশ দিনের যুদ্ধে দু'পক্ষে বিস্তর সৈন্যক্ষয় হল বটে, কিন্তু ভীষ্মবধের কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। পাণ্ডবদের যুদ্ধজয়ের পথে এ এক নিদারুণ সমস্যা। এই গুরু সমস্যার সমাধান এল একরাশ ফাঁক ও ফাঁকির মধ্যে দিয়ে। নিষ্পাপ ভীষ্মের ওপরে (অপরাধী শাল্বরাজের ওপরে নয়) অম্বার দুর্জয় ক্রোধ, বিদর্ভরাজকন্যার নারীকে বিবাহ করে উপহসিতা হওয়া; দেবতার বরে— প্রত্যক্ষত নয়— কিন্তু যক্ষ স্থূণাকর্ণের বদান্যতায় পুরুষত্বলাভ; সর্বজ্ঞ ভীষ্মের এ কথা জেনেও তাকে নারী রূপে গ্রহণ করা এবং ক্ষত্রিয়বীর অর্জুনের ছলনাকে আশ্রয় করে কৌরবপক্ষের শ্রেষ্ঠ সেনাপতিকে পরাস্ত করা— এ সবই পাঠককে একটা গোলকধাঁধার মধ্যে ঠেলে দেয়।

অথচ জীবনে তো এমনই ঘটে। ঘটনাও সরল নয়, তার মূলও সহজ নয়। ফলে তার আবেদনও বহুমুখী এবং মানুষকে প্রায়ই পরস্পর-বিরুদ্ধ আবেদনের সম্মুখীন হতে হয়। জীবনকে মানুষ যে ভাবে মেনে নেয়, বোঝবার চেষ্টা করে, জর্জরিত বোধ করে, তেমনই মহাভারতের কাহিনিতে সাড়া দিতে গিয়েও মানুষ বিপর্যস্ত, বিভ্রান্ত বোধ করে। যে রচনায় এই বিভ্রান্তি আসে তার জনপ্রিয়তা ঘটে না; সাধারণ মানুষ চায় সংবেদনে বিশ্রান্তি।

দ্রোণ: চারিত্রিক দ্বন্দ্ব

ভীষ্মের পর কৌরব সেনাপতি হলেন দ্রোণ। পাঁচদিন সমস্ত শক্তি ও নিষ্ঠা নিয়ে তিনি কৌরব পক্ষকে নেতৃত্ব দেন। দ্রোণের চরিত্র ও ভাগ্য বুঝবার জন্যে তাঁর অতীত জীবনে কিছু সূত্র কাজে লাগবে। দ্রোণের প্রথম জীবন কেটেছে চূড়ান্ত দারিদ্র্যে। বাল্য-সুহৃদ রাজপুত্র দ্রুপদ যৌবনে রাজা হন; তাঁর সভায় এসে দ্রোণ 'সখা' বলে কথা শুরু করতেই দ্রুপদ নিষ্করুণ রূঢ়বাক্যে জানিয়ে দেন, দরিদ্রের সঙ্গে ধনীর বন্ধুত্বের কোনও প্রশ্নই ওঠে না।[১] লাঞ্ছিত দ্রোণ ফিরে আসেন কঠিন সংকল্প নিয়ে: দ্রুপদের অহমিকা চূর্ণ করতে হবে। তিনি পাণ্ডব ও কৌরবদের অস্ত্রগুরুর পদ গ্রহণ করেন এই উদ্দেশ্যেই যে, তিনি অর্জুনের ধনুষ্মত্তাকে কাজে লাগাবেন, কৌরব সৈন্যদের পাবেন, দ্রুপদের কাছে সেই অপমানের প্রতিশোধ নেবেন। এরই জন্যে একলব্যের সঙ্গে ব্যবহারে দ্রোণ মিথ্যাচরণ করেন; যে একলব্যকে একদিনও তিনি শিক্ষা দেননি, শুধু দ্রোণাচার্যের মৃণ্ময় মূর্তি সামনে রেখে ধনুর্বিদ্যা অভ্যাস করেছে বলেই তার কাছ থেকে তিনি মর্মান্তিক নিষ্ঠুর গুরুদক্ষিণা আদায় করলেন। একলব্যের মনোভূমিতে দ্রোণ আচার্য, কিন্তু বাস্তবে দ্রোণ তো একদিনও তার শিক্ষার দায়িত্ব নেননি, সত্যকার দক্ষিণা তো তাঁর প্রাপ্যই ছিল না। তাই মিথ্যার আশ্রয় নিলেন দ্রোণ, পাণ্ডব কৌরবের শ্রদ্ধেয় আচার্য। বহু পূর্বে একলব্য একবার দ্রোণের কাছে অস্ত্রশিক্ষার জন্য প্রার্থী হয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তিনি জাতে নিষাদ বলে দ্রোণ তাকে শিষ্য করেননি।[২] যে নিচু জাতের মানুষ শিষ্য হতে পারে না, গুরুদক্ষিণা নেওয়ার বেলায় তো প্রকারান্তরে তাকে শিষ্য বলে স্বীকার করাই হল।

এ সব ছলনার মধ্যে আছে অর্জুনকে শ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদ করার প্রতিজ্ঞা, কারণ, একা অর্জুনই রাজি হয়েছিলেন দ্রোণ যা চাইবেন তাই গুরুদক্ষিণা দেবেন।[৩] তৎসত্ত্বেও নিজের ছেলে অশ্বত্থামার প্রতি স্নেহের বশে মাঝে মাঝেই পাণ্ডবদের কাজে পাঠিয়ে অশ্বত্থামাকে গোপনে

১. উদ্যোগপর্ব; (১৮৯:১৭)
২. আদিপর্ব, (১২২:৭)
৩. আদিপর্ব; (১২৩:১১)

কিছু বেশি বিদ্যা দান করতে চাইতেন। অর্জুন এ ছলনা বুঝে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে এসে পড়তেন, যাতে অশ্বত্থামা ধনুর্বিদ্যায় তাঁকে ছাড়িয়ে না যান। এখানেও দেখি দ্রোণের স্বার্থবুদ্ধি তাঁকে মিথ্যাচরণে প্ররোচনা দিচ্ছে। দ্রোণের মধ্যে ছলনার প্রবণতা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।[৪]

ধনসম্পত্তিতে লোভ তাঁর ছিল না। দ্রুপদকে দণ্ড দিতে প্রথমে কর্ণ ও দুর্যোধন গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। পরে অর্জুন কৃতকার্য হয়ে দ্রুপদকে বন্দি করে আনলে দ্রোণ দ্রুপদের অর্ধেক রাজ্যের রাজা হয়ে দ্রুপদকে বাল্যকালের সখ্য সম্বন্ধে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন যে, এত দিনে সমানে-সমানে অর্থাৎ রাজায় রাজায় বন্ধুত্ব পাকা হল। দ্রোণের মর্মস্থলে দীর্ঘকাল ধরে প্রকাশ্য রাজসভায় সেই অপমানের যে বাণ বিদ্ধ ছিল, এত দিনে তা উন্মূলিত হল। এ সব ঘটনায় পাঠকের প্রতিক্রিয়া একেবারে সহজ হয় না। রাজসভায় অপমানে সহানুভূতি দ্রোণের দিকেই থাকে; কিন্তু জন্মসত্বে যিনি রাজা সেই দ্রুপদ পরাজিত শত্রু রূপে কৌরব রাজসভায় এলে পাঠকের এক ধরনের অস্বস্তিও হয় সুদীর্ঘসঞ্চিত অপমানের এই তীব্র প্রতিশোধে।

ওই অর্ধেক রাজ্য দ্রোণ কোনও দিনই ভোগ করেননি, আমরণ কৌরব রাজসভাতেই ছিলেন। ছিলেন অস্ত্রগুরু রূপে আশ্রিত। যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে যুধিষ্ঠির যখন আচার্যদের পায়ে পড়লেন যুদ্ধ করার মিনতি নিয়ে, তখন অন্যদের মতো দ্রোণও বললেন, অর্থের জন্য তিনি কৌরবদের কাছে দায়বদ্ধ। এইখানে মনে পড়ে দ্রুপদের অর্ধেক রাজত্ব তাঁর অধিকারে ছিল। কাজেই অন্যায়কারী কৌরবদের অন্নদাস হওয়ারও তাঁর যথার্থ কোনও প্রয়োজন ছিল না, ওই অর্ধেক রাজ্যের রাজস্ব তো তাঁকে আর্থিক ভাবে স্বতন্ত্র ও স্বনির্ভর করতে পারত; তা হলে তিনি বিবেকের প্রণোদনায় অন্যায় থেকে বিরত থাকতে পারতেন। পাণ্ডবরা ন্যায় পক্ষে যুদ্ধ করছে এ কথা জেনে ও শুনে তো অন্তত তিনি যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য পক্ষত্যাগ করতে পারতেন। প্রথমত, তাঁর নিজের ওই অর্ধেক রাজ্য ছিল; দ্বিতীয়ত, তিনি তো সত্যিই কৌরবদের অন্নদাস নন; আচার্যের তো শিক্ষকতার বিনিময়ে কিছু প্রাপ্য থাকে, কাজেই এ ভাবে নিজেকে আত্মবিক্রীত জ্ঞান করার তো তাঁর সত্যি কোনও প্রয়োজন ছিল না। যে-দ্রোণ যথার্থ নিজের গুণে, শ্রমে ও সাধনায় ভরণপোষণের অনেক বেশিই দাবি করতে পারতেন, তিনি কেন অন্যায় জেনেও কৌরবপক্ষ ত্যাগ করতে পারলেন না? তাঁর ক্ষেত্রে কৌরবদের সঙ্গে দীর্ঘকালের যোগাযোগের মূল্যই কি ছিল এই আনুগত্য, যা তাঁকে ন্যায়-পথ থেকে সরিয়ে রাখল? এমন প্রশ্ন পাঠকের চিত্তকে ব্যাকুল করে তোলে।

যে পাঁচ দিন দ্রোণ সেনাপতি ছিলেন তারই তৃতীয় দিনের যুদ্ধে একটি বীভৎস হত্যাকাণ্ড ঘটে। বালক অভিমন্যু অর্জুনের সন্তান, কিন্তু কৌরববীরেরা সকলেই তাঁর আত্মীয় ও গুরুজন; চক্রব্যূহে প্রবেশ করে বালক যখন নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজে পাচ্ছে না, তখন যাঁরা তার পথ

৪. আদিপর্ব; ১২২:৪৩-৪৪

রুদ্ধ করে রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে দ্রোণও ছিলেন। চক্রব্যূহে অবরুদ্ধ কিশোরকে তিনিও অস্ত্রাঘাত করেন।[৫] পুত্রকল্প অর্জুনের পুত্রকে এই রকম অসহায় ভাবে বধ করতে দ্রোণের দ্বিধা হয়নি। শিষ্যও শাস্ত্রমতে পুত্রকল্প; একলব্য তাঁকে গুরুজ্ঞান করে সাধনা করছিল, অর্জুনের প্রীত্যর্থে সেই একলব্যের ডান হাতের বুড়ো আঙুল দক্ষিণা চাইতেও তাঁর দ্বিধা হয়নি। পাঠক এটা সহজে মেনে নিতে পারে না, যুদ্ধের অলঙ্ঘ্য নীতি হিসেবেও না। এই নিষ্ঠুরতার মূল্য তাঁকে শোধ করতে হয়েছিল।

যুদ্ধের পঞ্চদশ দিনে পাণ্ডবরা অধীর, দ্রোণ দুর্ধর্ষ অস্ত্রবিৎ, দুর্জয়পরাক্রম প্রতিপক্ষ, তাঁর মৃত্যু না হলে যুদ্ধ নিষ্পত্তি হতে পারছে না. কৌরবপক্ষে কর্ণও অপেক্ষা করছেন; আসলে দ্রোণ বেঁচে থাকতে দুর্যোধন কর্ণকে সেনাপতি করতে রাজি হবেন না। কাজেই শৌর্যাভিমানী কর্ণের উন্নতি ও গরিমার জন্যেও দ্রোণের মৃত্যু প্রয়োজন।

এই মৃত্যু ঘটে কী ভাবে? কৃষ্ণের পরামর্শে যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধরত দ্রোণকে বলতে হল, 'অশ্বত্থামা হত'। কথাটা অন্য কেউ বললে পুত্রগর্বিত দ্রোণ উড়িয়ে দিতেন, কিন্তু বলছেন স্বয়ং যুধিষ্ঠির; শুধু ধর্মপুত্র নন, ধর্মাচরণের জন্য যিনি যশস্বী। এই সর্বৈব মিথ্যাটাতে যুধিষ্ঠিরের অন্তরাত্মাও স্বস্তি পায়নি, তাই সেটাকে শোধন করবার জন্য নিচুস্বরে যোগ করলেন 'ইতি গজ' অর্থাৎ মরেছে অশ্বত্থামা নামে হাতিটি।[৬] কিন্তু তাতেও কথাটা যে পরিশোধিত হয়ে সত্য ভাষণে পরিণত হল না তার প্রমাণ আছে। যুধিষ্ঠির সত্যনিষ্ঠ, সত্যবাদী, তাই তাঁর রথ মাটি থেকে চার আঙুল ওপরে থাকত। দ্রোণকে এই ডাহা মিথ্যে কথাটি বলার পরে 'ইতি গজ' যোগ করার পরেও তাঁর রথ ভূমিস্পর্শ করল, আর কখনওই সে রথ মাটি ছেড়ে ওঠেনি।[৭]

পুত্রকল্প দুটি বালক, একলব্য ও অভিমন্যুর ওপরে দ্রোণ নিষ্ঠুর আচরণ করেছেন। একলব্যের ক্ষেত্রে, এবং অশ্বত্থামাকে গোপনে অর্জুনের চেয়ে বেশি ধনুর্বিদ্যা দান করার চেষ্টার মধ্যে স্পষ্ট মিথ্যাচার ছিল, তাই যেন এক মিথ্যা উক্তিই তাঁর মৃত্যুর হেতু হল। অস্ত্রত্যাগ করে যোগাসীন হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন; প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র অশ্বত্থামাই যখন বেঁচে নেই, তখন কার জন্যে যুদ্ধ, কার জন্যে জয়, কার জন্যে জীবন?

রামায়ণের কোনও বীরের মৃত্যুরই এত বহুমুখী দ্যোতনা নেই, সেখানে ভাগ ভাল-মন্দ, সাদা-কালোতে। কিন্তু দ্রোণ? রাজ্য পেয়েও যিনি রাজ্য গ্রহণ বা ভোগ করেন না, সেই আর্থিক স্বাতন্ত্র্যের জোরেও যিনি অন্যায় পক্ষে লড়ছেন জেনেও দলত্যাগ করেন না, তাঁর মৃত্যু ঘটানো হল কৃষ্ণের প্ররোচনায় সদাসত্যবাদী যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা বলিয়ে। দ্রোণ একটা মিথ্যা উক্তির জন্যে প্রাণত্যাগ করছেন এতে পাঠকের সহানুভূতি যথার্থ কারণেই দ্রোণের অভিমুখে যাবে; কারণ তাঁর মৃত্যুর নিমিত্ত একটা মিথ্যাভাষণ। কিন্তু তিনিও তো জীবনে

৫. দ্রোণপর্ব; (৩৬:২৬)
৬. দ্রোণপর্ব; (১৬৪:১০৬)
৭. দ্রোণপর্ব; (১৬৪:১০৭)

মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন একাধিকবার, কাজেই মিথ্যার দ্বারা তাঁর নিধন যেন কোনও এক নৈতিক সুবিচারের ক্ষেত্রে পাঠক মেনেও নেয়। যুদ্ধারম্ভে যুধিষ্ঠিরের আবেদনে যিনি সাড়া দেননি, তিনি সব দায়বদ্ধতা অস্বীকার করলেন পুত্রস্নেহের বশে। এর মধ্যে একটা করুণ দিক থাকা সত্ত্বেও ক্ষত্রিয় বীরের পক্ষে একটা অনৌচিত্যও আছে। অভিমন্যুর মৃত্যুতে অর্জুন যুদ্ধত্যাগ করেননি। ঘটোৎকচের মৃত্যুতে ভীমও যুদ্ধ ত্যাগ করেননি। পুত্রশোকে দ্রোণের যুদ্ধত্যাগ ও মৃত্যু এ-ঘটনায় পাঠকের প্রতিক্রিয়া বহুমাত্রিক— আবেগের দিকে এক ধরনের, আবার নৈতিকতার দিকে আর এক রকম; এবং মিথ্যাচারণের পরিণতি মিথ্যাভিত্তিক মৃত্যুতে পাঠকের উদ্যত সহানুভূতিও কোথাও বাধা পায়। জীবনের বহু অধ্যায়ে এমন প্রতিক্রিয়াই যথার্থ এবং ব্যঞ্জনায় অস্থির এবং সেই কারণেই অধিক দ্যুতিময়। কিন্তু এ-কাহিনি পাঠকের গতিকে ব্যাহত করে, থামায়, ভাবতে বাধ্য করে এবং সংশয়ের মধ্যে ফেলে, প্রচণ্ড জনপ্রিয়তার পক্ষে যা একটুও অনুকূল নয়। অথচ এই ভাবনা, যা জীবনের অর্থ বোঝাবারই এক প্রয়াস তার দ্বারাই মহাকাব্যটি নিছক কাব্যত্ব পেরিয়ে মহাকাব্যে উত্তীর্ণ হয়। এই উত্তরণের প্রক্রিয়াটিকে অন্তঃস্থ করতে হয়, এবং সেটি যথার্থই আত্মিক উত্তরণের যন্ত্রণাময় একটি প্রক্রিয়া। এখানেই মহাভারতে সাড়া দেওয়ার আর্তি ও ক্লেশ।

কর্ণ: সংবেদনার জটিলতা

দ্রোণের মৃত্যুর পর দুর্যোধন তাঁর পূর্ব প্রতিজ্ঞা মতো সেনাপতি পদে বরণ করলেন কর্ণকে। যুদ্ধের ষোড়শ ও সপ্তদশ দিনের সেনাপতি কর্ণ। কৌরব পক্ষে যখন মহাভারত রচনা হচ্ছিল, অর্থাৎ কৌরব রাজত্বে ভাটচারণরা যখন যুদ্ধের সময় গান বাঁধছিলেন ও গাইছিলেন, তখন স্বভাবতই সে সব গানের বিষয়বস্তু ছিল কৌরবদেরই যশোগাথা। এই কৌরবপক্ষীয় মহাকাব্যের নায়ক ছিলেন কর্ণ। পৃথিবীর সব প্রাথমিক মহাকাব্যেরই নায়ক সূর্যের পুত্র, কর্ণও তাই; এবং তাঁদের মতোই শৈশবে পরিত্যক্ত, তাঁদের মতো বীর ও উদার। কর্ণের এই উদারতার সুযোগ নিয়ে ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র কর্ণের সহজাত কবচকুণ্ডল চেয়ে নিয়েছিলেন, বিনিময়ে কর্ণ একঘ্নী অস্ত্র চেয়ে নেন।[১]

জন্মক্ষণে কর্ণকে কুন্তী পেটিকায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, সারথিকুলের অধিরথ ও রাধা তুলে নিয়ে লালন করেন, দীর্ঘকাল পর্যন্ত কর্ণ তাঁদেরই পিতামাতা বলে জ্ঞান করতেন।[২] ধৃতরাষ্ট্রের সভায় এসে অস্ত্রশিক্ষা করেন দ্রোণাচার্যের কাছে, বন্ধুত্ব হয় দুর্যোধনের সঙ্গে। কৈশোরের প্রান্তে পরশুরামের কাছে নিজেকে ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়ে ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করতে যান. তখনই সম্পূর্ণ ভুল করে গোহত্যা করে ফেলেন এবং অভিশপ্ত হন: যুদ্ধের শেষে তাঁর রথের চাকা বসে যাবে এবং সেই অবসরে প্রতিপক্ষ তাঁকে হত্যা করবে।[৩] পরশুরাম কর্ণের কোলে মাথা রেখে একদিন ঘুমোচ্ছিলেন, তখন অলর্ককীট কর্ণের উরুতে দংশন করে, রক্তপাত করে এবং দংশন করতেই থাকে। রক্তাক্ত উরু নিয়ে কর্ণ অবিচলিত নিশ্চল ভাবে বসে থাকেন। ঘুম ভেঙে সব দেখে পরশুরাম নিশ্চিত বুঝতে পারলেন, যে কর্ণ পরিচয় গোপন করে অস্ত্রবিদ্যা অর্জন করতে এসেছেন, আসলে তিনি ক্ষত্রিয়; কারণ কোনও ব্রাহ্মণের এত শারীরিক সহনশীলতা থাকতে পারে না। তখন কর্ণ সব স্বীকার করলেন। পাঠকের সংশয় থেকে যায়, কারণ সে-সময়ে কর্ণ নিজেকে সূতপুত্র বলেই জানতেন, ক্ষত্রিয়

১. আদি; (১০৪:১৮-২০)
২. আরণ্যক; (২৯৩:১০, ১৩-১৪)
৩. কর্ণ; (২৯:৩১)

পরিচয় তখনও প্রকাশিত হয়নি। পরশুরাম অভিশাপ দিলেন: অধীত অস্ত্রবিদ্যা কার্যকালে কর্ণ স্মরণ করতে পারেন না।[৪] যৌবনের শুরুতেই এ-দুটি অভিশাপ নেমে এল কর্ণের জীবনে।

কর্ণের জীবনের এই ছোট উপাখ্যানটি এক দিকে অত্যন্ত মর্মবিদারক, কারণ ক্ষত্রিয় হিসেবে জন্মেও কোনও দিনই তিনি ক্ষত্রিয়োচিত কোনও সুযোগ সুবিধা পাননি। ক্ষত্রিয়সুলভ আগ্রহে পরশুরামের কাছে অস্ত্রশিক্ষার আশায় যান, কারণ ক্ষত্রিয়-বিদ্বেষী পরশুরাম ক্ষত্রিয় জানলে অস্ত্রবিদ্যা দেবেন না; তাই ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়েছিলেন। কৌরব গুরুরা সূতপুত্রকে অস্ত্রবিদ্যা দিতেন না তাই এই ছলনা; কিন্তু পরশুরামের কাছে অস্ত্রবিদ্যা যা পেয়েছিলেন তাকে ছাপিয়ে উঠল এই নির্মম অভিশাপ— কার্যকালে প্রয়োগ করতে পারবেন না, এবং যুদ্ধ শেষে তাঁর রথের চাকা বসে যাবে। এই সাংঘাতিক অভিশাপে কর্ণ পাঠকের সহানুভূতি অর্জন করেন।

হস্তিনাপুরে অস্ত্রশিক্ষা শেষে অর্জুনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে উদ্যত হলে, অর্জুন রাজা বা রাজপুত্র ছাড়া কারও সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না বলাতে দুর্যোধন তৎক্ষণাৎ কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। বিনিময়ে শুধু কর্ণের বন্ধুত্ব চাইলেন। এর পর প্রতিযোগিতায় কর্ণের অধিকার জন্মাল, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই অধিরথ রাজসভায় উপস্থিত হলেন, এবং কর্ণ তাঁকে পিতৃসম্ভাষণ করে প্রণাম করলে ভীম ব্যঙ্গপরিহাস করলেন।[৫] প্রতিযোগিতা হল না। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভাতেও কর্ণ লক্ষ্যভেদ করতে উদ্যত হলে দ্রৌপদী স্পষ্টই বললেন তিনি সূতপুত্রকে বরণ করবেন না। নীরবে সরে আসতে হল কর্ণকে, কিন্তু অপমান ভোলেননি। ভেতরে ভেতরে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠলেন।

দ্যূতসভায় প্রতিশোধ নিলেন এবং তখনই কর্ণচরিত্র কলঙ্কিত হল, ক্ষোভ অপমানের অতিকৃত এবং বিকৃত প্রকাশে। যুধিষ্ঠির জুয়াতে দ্রৌপদীকে হারাবার পর কর্ণ দুর্যোধন দু'জনেই হিংস্র বিদ্রূপে সভায় জোর করে টেনে আনা এক কুণ্ঠিত রাজকুলবধূকে অপমান করলেন।[৬] মহাকাব্যের এইখানেই প্রথম কৌরব-পাণ্ডব যেন সুনীতি-দুর্নীতির প্রতিরূপ হয়ে উঠল, যদিও এর মধ্যেও কিছু কিছু অতিব্যাপ্তি অব্যাপ্তি থেকে গেল। দ্রৌপদীকে দাসী ও বহুভোগ্যা বলে উল্লেখ ও সম্বোধন করে কর্ণ যখন আপন উরুতে হাত রেখে অশালীন ইঙ্গিত করলেন, তখন ক্ষত্রিয় বীরের মর্যাদা থেকে আপনিই বিচ্যুত হয়ে নেমে এলেন এক অমার্জিত কামুকের পর্যায়ে। যদিও এর মধ্যে স্বয়ংবরসভায় প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধ নিহিত ছিল, তবু পাঠকের তো মনে হতেই পারে যে রাজকন্যা দ্রৌপদী সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে যদি সূতপুত্রকে বিবাহ করতে অস্বীকার করে থাকেন, তবে তিনি তাঁর অধিকারের মধ্যে থেকেই তা করতে পারেন।

৪. কর্ণপর্ব; (২৯:৬)
৫. আদি; (১:১৮৬:২২)
৬. সভাপর্ব; (৬০:৩৮)

তার জন্যে তাঁকে জঘন্য সম্বোধনে বিশেষিত করে, প্রকাশ্য সভায় নারীকে, কুলবধূকে অপমান করতে পেরে শ্লাঘা বোধ করা ক্ষত্রিয়োচিত কাজ নয়, পুরুষোচিতও নয়।

না জেনে গোহত্যা করে মর্মান্তিক অভিশাপ পেতে হয়েছিল বলে অবশ্যই কর্ণের পক্ষে পাঠকের সহানুভূতি আসে কিন্তু দ্রৌপদীকে এ ভাবে লাঞ্ছনা করায় পাঠকের মনে জুগুপ্সা জন্মায়। তেমনই অভিমন্যুবধের সময়েও কর্ণ সক্রিয় ভাবেই উদ্যোগী ছিলেন, এটাও গর্হিত কাজ; তাই অভিমন্যুর পিতা অর্জুন পরে যখন কর্ণপুত্র বৃষসেনকে হত্যা করে তখন পাঠকের উদ্যত সহানুভূতি প্রতিহত হয়।[৭]

কর্ণের বীরত্ব, শৌর্য নিয়ে কোনও সংশয় নেই, সেখানে তিনি কারও চেয়ে কম নন। আজন্ম অবিচার দুর্বিচার ও অন্যায় লাঞ্ছনা পেয়েছেন। পরশুরামকে প্রতারণা করে যে বিদ্যা অর্জন করেছিলেন, নির্মম কীট-দংশনে ওই রক্তপাতে অবিচলিত থেকে গুরুর নিদ্রাভঙ্গ ঘটতে দেননি, তবু ওই সাধনাও তাঁর সম্পূর্ণই ব্যর্থ হল। সহজাত কবচ-কুণ্ডল একজন দেবতা প্রতারণা করে কেড়ে নিলেন। বিনিময়ে যে একঘ্নী অস্ত্র দিলেন, ঘটনাচক্রে ঘটোৎকচকে বধ করতেই সেটা খরচ হয়ে গেল, তা দিয়ে কোনও পাণ্ডব বীরকে বধ করা হল না। সে দিক থেকেও সহজাত কবচকুণ্ডল দানের বিনিময়ে কর্ণ তেমন কিছুই পাননি; পেয়েছেন অনর্জিত অভিশাপ, দেবতার প্রতারণা, মানুষের কাছে সূতপুত্র পরিচয়ের লাঞ্ছনা, জন্মক্ষণে নিষ্পরিচয়ের অন্ধকারে নির্বাসন— শুধুমাত্র নিজের শৌর্য ও দুর্যোধনের সখ্য ছাড়া তাঁর জীবনে আর কোনও মূলধন ছিল না।

কিন্তু এই সব অবিচার ও অপমানের আঘাতে তাঁর জীবনের গভীরে কোথাও একটা কঠিন হীরে দানা বাঁধছিল। সেটা প্রকাশ হল প্রথমে কৃষ্ণ ও পরে কুন্তি যখন তাঁকে তাঁর যথার্থ পরিচয় জানিয়ে পাণ্ডব পক্ষে যোগ দিতে বলেন। কৃষ্ণকে তিনি ভবিষ্যদ্বক্তার মতোই আপন মৃত্যুর যথাযথ অগ্রিম বিবরণ দেন, এ-ও বলেন যে, কৌরব পক্ষে থাকলেও তিনি পাণ্ডবদের কল্যাণকামনা করেন; বলেন, যুধিষ্ঠিরকে যেন কোনও মতেই তাঁর সত্য পরিচয় না জানানো হয়, তা হলে যুদ্ধই হবে না। কুন্তিকে বলেন, অধিরথ ও রাধা তাঁকে তাঁর সম্পূর্ণ অসহায় শৈশব থেকে লালন করেছেন, আজ সহসা তাঁদের পিতৃমাতৃ-পরিচয় অস্বীকার করা অন্যায় হবে। যেমন অন্যায় হবে দুর্যোধনের সখ্যকে পদদলিত করে কৌরবপক্ষ ত্যাগ করা। কুন্তিকে কথা দিলেন, একা অর্জুন ছাড়া অন্য কোনও পাণ্ডবের তিনি ক্ষতি করবেন না, কাজেই তাঁকে ধরে, বা অর্জুনকে ধরে, কুন্তির পাঁচটি পুত্রই থাকবে।[৮] যে দিন কুন্তির মাতৃত্ব, সূর্যের পিতৃত্ব প্রকাশিত হল সে দিন তিনি সমাজে মাথা উঁচু করে থাকতে পারতেন। বাল্য-কৈশোর-যৌবনের যে-দিনগুলো কেটেছে অবহেলিত সূতপুত্র পরিচয়ে সেগুলো আড়ালে চলে যেতে পারত। কিন্তু, আজ যখন মৃত্যু আসন্ন, তখন পক্ষ পরিবর্তন করার

---

৭ সভাপর্ব, (৬১:৩৫; ৬৩:১০,১১)

৮. কর্ণপর্ব: (৬২:৬০)

প্রস্তাব তিনি কোনও ক্রমেই গ্রহণ করতে পারেন না। গ্রহণ করতে পারলে সুস্থতর চিত্তে ন্যায়পক্ষে যুদ্ধ করার শান্তি পেতেন, পেতেন কুন্তিসুত ও জ্যৈষ্ঠ পাণ্ডবের গৌরব। কিন্তু কি অনায়াসে সে প্রলোভন জয় করলেন। হয়তো অনায়াসে নয়, মুহূর্তের জন্য প্রলুব্ধ হয়ে থাকতেও পারেন, কিন্তু কোথাও তার এতটুকু প্রকাশ রইল না। দৃঢ় ভাবে প্রলোভন জয় করলেন, পরিচয়ের গ্লানিমুক্তির সম্ভাবনাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। যুদ্ধশেষে কুন্তি যখন যুধিষ্ঠিরকে বললেন কর্ণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করতে, কারণ তিনিই জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব, তখন যুধিষ্ঠির ভর্ৎসনা করলেন কুন্তিকে, সক্ষোভে বললেন এই না-জানানোটা কুন্তির পক্ষে খুবই গর্হিত কাজ হয়েছে। কিন্তু কর্ণের এ প্রলোভন-জয় তাঁর চরিত্রকে অম্লান ও ভাস্বর করে তোলে।

শেষ কালে না জেনে তাঁর গাভী হত্যার জন্য, সেই ব্রাহ্মণের সম্পূর্ণ অন্যায় অভিশাপ ফলল; রথের চাকা কাদায় বসে গেল, মহাশক্তিশালী বীর কোনও মতেই টেনে তুলতে পারলেন না। উদ্যোগপর্বে কৌরব পাণ্ডব উভয়েই যুদ্ধ সম্বন্ধে কয়েকটা সাধারণ নীতি স্বীকার করেছিলেন; তার মধ্যে একটা ছিল, প্রতিপক্ষ সময় চাইলে সময় দিতে হবে, এমনকী এ ভাবে বিপদে পড়লে তাকে সাহায্যও করতে হবে। সাহায্য পাওয়া দূরে থাক, সময় চেয়েও পেলেন না। তাঁর মৃত্যুর পুরো ব্যাপারটা আগাগোড়াই অন্যায়। ব্রাহ্মণের শাপ সম্পূর্ণ অন্যায়, সেটা ফলে যাওয়াও অন্যায়; সময় চেয়ে না পাওয়াটা পাণ্ডবদের দিক থেকে গর্হিত কাজ, অসহায় বিপন্ন বীরের সংকটের সময়ে তাকে বধ করাও অন্যায়। কাজেই অন্যান্য প্রধান কৌরব বীরের মতো কর্ণও অন্যায়-সমরেই প্রাণ দিলেন। এ মুহূর্তে পাঠকের পুরো সহানুভূতিই তাঁর প্রতি ধাবিত হয়, কোনও দ্বিধা থাকে না। কিন্তু একটু দূরে দাঁড়িয়ে ভাবলে মনে আসে, দুর্যোধনের সঙ্গে পরামর্শ করে আকৈশোর পাণ্ডবদের ক্ষতির সব ষড়যন্ত্রে কর্ণ অংশগ্রহণ করেছেন, জতুগৃহদাহের ব্যাপারেও তাঁর সক্রিয় সহায়তা ছিল। দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা অমানবিক, অপুরুষোচিত, তাতে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল, এ দিক থেকে তাঁর বধ ও বিনাশ পাণ্ডবদের করণীয়ই ছিল। আবার তারও পিছনে যখন ভাবি যে, স্বয়ংম্বর সভায় দ্রৌপদী যে-কারণে তাঁকে অপমান করেন সে কারণটাই তো মিথ্যে, কর্ণ তো সত্যিই সূতপুত্র নন, পাণ্ডবদের মতো 'দেবপুত্র'ই অস্ত্রপরীক্ষার দিন যদি অধিরথ সভায় প্রবেশ করা মাত্রই কর্ণ উঠে দাঁড়িয়ে পিতৃসম্ভাষণ ও প্রণাম না করতেন তা হলে একটা প্রকাশ্য গৌরবের অংশভাক হতে পারতেন। কিন্তু পরিণাম জেনেও তিনি অকৃতজ্ঞ বা অমানবিক আচরণ করেননি। সে দিন ভীমের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের ভিত্তিটাই ছিল মিথ্যে, তিনি অধিরথের পুত্র সত্যিই তো ছিলেন না। মানবিক অহংকারের বশে তিনি বৃদ্ধ অধিরথকে পিতার প্রাপ্য সম্মান দিলেন, কারণ এই কর্ণই বলেছিলেন:

> সূতো বা সূতপুত্রো বা যো বা কো বা ভবাম্যহম্।
> দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং তু পৌরুষম্।

সারা জীবন আপন শৌর্যের আসন ছাড়া পায়ের নীচে আর কোনও খাঁটি জমি পাননি।

একটা সম্পূর্ণ মিথ্যে কারণের অভিশাপ ফলল প্রতিপক্ষের অন্যায় আচরণের সাহায্যে। জীবনে যা কিছু অন্যায় করেছিলেন— এবং তার পরিমাণ এবং সংখ্যা কম হলেও গুরুত্ব কম নয়— তার পুরো মূল্য শোধ করে দিলেন অন্যায় সমরে ওই মুহূর্তে সম্পূর্ণ নিরাপরাধ অবস্থায় প্রাণ দিয়ে। এবং যেহেতু কৌরবপক্ষে রচিত মহাভারতের তিনিই ছিলেন নায়ক, তাই নায়কের মৃত্যুতে যে প্রতিক্রিয়া পাঠকের মনে হওয়ার কথা সেই অবিমিশ্র শ্রদ্ধা করুণা সহানুভূতি তিনি এ মুহূর্তে পুরোপুরি আকর্ষণ করেন। পাঠক সম্পূর্ণ ভাবে অবহিত থাকেন যে, বহু বিরুদ্ধ শক্তির এককালীন সমাপতনের ফলেই কর্ণের মৃত্যু ঘটতে পারল, কারণ মহাকাব্যের প্রথম পর্যায়ের সূর্য-পুত্র এই নায়কের মৃত্যুও তাকে এক অগ্রণী বীরের মর্যাদায় মণ্ডিত করল। তাঁর সারা জীবনের বহু সন্ধিক্ষণে পাঠকের নানা মিশ্র ও বিরূপ সংবেদনা যেন মৃত্যুর মোহানায় এসে বৃহৎ একটি গৌরবে লীন হয়ে গেল।

•

জীবনদর্শনের পার্থক্য

যুদ্ধের সতেরো দিনের দিন কর্ণের মৃত্যু হয়। আঠারো দিনের আধবেলার সেনাপতি ছিলেন শল্য। কিন্তু তার আগেই তাঁর বেশি পরিচয়, কর্ণের সেনাপতিত্বকালে শল্য ছিলেন কর্ণের সারথি। মদ্র বা বাহ্লীক দেশের রাজপুত্র শল্য, মাদ্রীর ভাই। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে শল্য ধনুতে জ্যা আরোপ করতে পারেননি। শল্যকে প্রথম থেকেই দেখি আনুগত্যের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত। ইচ্ছে ছিল পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করার; কিন্তু দুর্যোধন তাকে এমন খাতির করেন যে, তিনি কৌরবপক্ষেই যোগ দেন। তবু যুদ্ধের ঠিক আগে পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের বিজয়কামনা ও আশীর্বাদ জানান। তাঁর পাণ্ডবকৌরবপক্ষ সম্বন্ধে দোলাচলচিত্ততা বুঝতে পেরে যুধিষ্ঠির তাঁর কাছে অনুরোধ করেন যেন শল্য যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণের সারথি হন এবং কর্ণকে তেজভ্রষ্ট করেন।[১] এখানে একটা কথা আছে: সারথির দুটি কাজ, একটা রথ সম্বন্ধে, অর্থাৎ সাবধানে বিপদ এড়িয়ে কৌশলে রথ চালানো; আর দ্বিতীয় কাজ হল, রথারূঢ় যোদ্ধাকে অস্ত্র, বাণ, ইত্যাদি এগিয়ে দেওয়া এবং তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, রথীকে প্রশংসা করে, অভয় দিয়ে, তাকে অজেয় বলে উল্লেখ করে, তার মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখা।

যুদ্ধক্ষেত্রে শল্য কর্ণকে প্রশংসা করা দূরে থাক, বারবার বলেছেন, অর্জুনকে কেউ জয় করতে পারবে না। তিনি দুর্ধর্ষ ধনুর্বিদ, তাঁর জ্ঞান, কৌশল ও অস্ত্রসিদ্ধির সামনে কেউ দাঁড়াতেই পারে না, অর্জুনকে যুদ্ধে পরাস্ত করার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এটা সারথির ধর্মবিরুদ্ধ, মিত্রপক্ষের লোকের ভূমিকায় থেকে শত্রুপক্ষের কাজ করেছেন শল্য। তাঁর কর্ণের সারথি হতে অস্বীকার করা উচিত ছিল; যেহেতু তাঁর মনের আনুগত্য পাণ্ডবপক্ষে। অথবা এ সত্ত্বেও যখন সারথি হয়েছিলেন তখন যুধিষ্ঠিরের কাছে পাণ্ডবপক্ষে আনুগত্য সম্বন্ধে কথা দেওয়া[২] অন্যায়, অধর্মীয় প্রতিশ্রুতি— অর্জুনের প্রশংসা করে, কর্ণের আপেক্ষিক অক্ষমতার কথা উল্লেখ করে কর্ণের মতো অস্ত্রজ্ঞ বীরের মনোবল নষ্ট করার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা তার উচিত ছিল না। এখানে শল্য সম্বন্ধে পাঠকের মনোভাব দ্বিধা-বিভক্ত হতে বাধ্য। প্রাথমিক

১. উদ্যোগপর্ব; (১৪৪.২২)
২. উদ্যোগপর্ব; (৮:২৭)

আনুগত্য তাঁর কৌরবপক্ষে, অথচ ষড়যন্ত্রীর মতো গোপনে তিনি যুধিষ্ঠিরের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, যথার্থ সারথির ভূমিকা তিনি পালন করবেন না বরং কৌরবদের শত্রুতা করবেন। যুদ্ধের নীতি অনুসারে তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত গর্হিত, কাজেই শল্য সম্বন্ধে পাঠক অবজ্ঞা ও ঘৃণা বোধ করেন। কর্ণ নানা দোষে দোষী, এমনকী রথের চাকা বসে যাওয়ার পিছনেও তাঁর পূর্ব অপরাধের অভিশাপই ছিল সক্রিয়। কিন্তু কুচক্রী শল্যের কোনও মার্জনা নেই। এবং এ-ই হল কৌরবদের শেষ সেনাপতি। দায়িত্ব পালন করা দূরে থাক, বিশ্বাসঘাতকতা করলেন কর্ণের মতো বীরের সঙ্গে— এমন একটা সময়ে যখন তার প্রতিকার করা কর্ণের সাধ্যের বাইরে। শল্যের আনুগত্য দ্বিধাবিভক্ত— কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষে, পাঠকেরও প্রতিক্রিয়া তাই নীতি ও দুর্নীতির মধ্যে বিভ্রান্ত।

যুদ্ধের একেবারে শেষ প্রহরের ঘটনা স্বল্পকালীন শেষ সেনাপতি দুর্যোধনের মৃত্যু। আঠারো দিনের প্রত্যেক দিনই দুর্যোধন যুদ্ধ করেছেন, আহত হয়েছেন। একে একে ভাই-জ্ঞাতিবান্ধবদের মৃত্যু দেখতে হয়েছে তাঁকে, এবং প্রখ্যাত কৌরববীরদের অন্যায় সমরে মিথ্যাচরণের মধ্যে নিহত হতে দেখতে হয়েছে। কাজেই দুর্যোধন তখন শরীরে মনে বিধ্বস্ত। স্বল্পকাল বিশ্রামের জন্য দ্বৈপায়ন হ্রদের মধ্যে গিয়ে শুয়েছিলেন; তখন ভীম ও অন্যান্য পাণ্ডব বীররা গিয়ে বিদ্রুপ ও বক্রোক্তি করে তাঁকে উঠে এসে যুদ্ধ করতে বলেন। শ্রান্ত বিষণ্ণ দুর্যোধন উঠে আসেন। তাঁর প্রধান শিক্ষা গদাযুদ্ধে, তাই পাণ্ডবপক্ষের সুশিক্ষিত গদাযোদ্ধা ভীমের সঙ্গেই তাঁর যুদ্ধ। ভীম প্রবল যোদ্ধা, কিন্তু গদাতে দুর্যোধনের দক্ষতা বেশি, এই জন্য কিছুক্ষণ যুদ্ধ হওয়ার পরে কৃষ্ণের ইশারায় অর্জুন ভীমকে দুর্যোধনের উরুতে আঘাত করবার ইঙ্গিত দেন। ভীমও গদাঘাতে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করেন; এর পরে ভীম বাঁ পা দিয়ে দুর্যোধনের মাথা চূর্ণ করতে উদ্যত হলে দুর্যোধন কৃষ্ণকে ধিক্কার দেন ও ভীম নিরস্ত হন।[৩]

ধিক্কার কেন? দুটি কারণে। উদ্যোগপর্বে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে পাণ্ডব ও কৌরবরা উভয়ের প্রতি প্রযোজ্য কতকগুলি নীতি স্থির করেন। তার একটা হল, রণক্লান্ত সৈনিকের বিশ্রামের অধিকার আছে এবং বিশ্রামের সময়ে তাকে জোর করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করানো যাবে না। পাণ্ডবরা এ শর্তটি মানলেন না। দ্বিতীয়ত, একটি বড় শর্ত স্বীকৃত হয়েছিল, অধোনাভি প্রহার করা রণনীতি-বিরোধী; উরু অধোনাভি, সেখানে আঘাত করা তাই বেআইনি। এটা করতে হল, কারণ কৃষ্ণ ও পাণ্ডবরা জানতেন যে, কৃত্যারা (মূর্তিমতী জাদুশক্তি) দুর্যোধনকে নির্মাণ করার সময়ে কটির ঊর্ধ্বদেশের দেহকে দুর্ভেদ্য কঠিন লৌহের দ্বারা গঠন করে, কটির নিম্নদেশ ফুল দিয়ে নির্মাণ করেন; অর্থাৎ ওই অংশটিই সহজভেদ্য।[৪] যুদ্ধের আইন মেনে চললে ভীমের যতই দক্ষতা থাকুক না কেন, দুর্যোধনের দেহকে ক্ষত বা বিদ্ধ করতে পারতেন না। তাই এই বেআইনি অধোনাভি আঘাত।

৩ উদ্যোগপর্ব; (৮.৩০-৩২, কর্ণ, ২৭:৪২-৪৬)

৪. শল্যপর্ব; (৫৮.৫, ৬০ ২৭-৩৮)

দুর্যোধন অনেক দুষ্কর্ম করেছেন, যার প্রধান হল প্রকাশ্যে রাজসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে সমর্থন, এবং নিজের বাম উরুতে আঘাত করে পতিব্রতী দ্রৌপদীকে তাঁকে পতিরূপে ভজনা করার অশালীন ইঙ্গিত। পাঠকের মনে হয় সেই যে সে দিন উরুতে চপেটাঘাতের ইঙ্গিতের দ্বারা কুলস্ত্রীর চূড়ান্ত অবমাননা ঘটেছিল, তারই প্রতিশোধে কৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন নিজের উরুদেশ দেখিয়ে ভীমকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে দেহের উর্দ্ধভাগে সম্পূর্ণ দুষ্প্রধর্ষ্য দুর্যোধন, অতএব উরুভঙ্গ করা ছাড়া তাঁকে পরাজিত বা নিহত করার কোনও উপায় নেই।[৫] এ সবের মধ্যে যেন কোনও এক ভাবে একটা গর্হিত কর্ম শোধ হল অনুরূপ একটা গর্হিত কর্মের দ্বারা। পাণ্ডবদের উদ্ভাবিত উপায়টি যতই অত্যাবশ্যক হোক, যে সব শর্ত যুদ্ধের প্রাক্কালে উভয়পক্ষই মেনেছেন, তার একটা শর্তকে এ ভাবে লঙ্ঘন করলে স্বভাবতই দুর্নীতির কলঙ্ক স্পর্শ করে পাণ্ডবদের। অতএব মহাবীর দুর্যোধনের এই নীতিহীন ভাবে মৃত্যু ঘটানোর জন্য সে মুহূর্তে অপরাধী দুর্যোধনকে ছাপিয়ে ওঠে অপরাধিত দুর্যোধন। পাঠকের দুর্যোধনের অতীত অপরাধ সম্বন্ধে যত ক্রোধ বিরাগই থাকুক না কেন, মৃত্যুর মুহূর্তে দুর্নীতির কাছে বলিপ্রদত্ত ভগ্নোরু ধূলিশায়ী দুর্যোধন করুণার সঞ্চার করেই।

রামায়ণের যুদ্ধে রাবণ রামকে মায়াসীতা ও সীতাকে রামের মুণ্ড দেখালেও মৃত্যুটা তাঁর যুদ্ধনীতিকে লঙ্ঘন করে হয়নি; সীতাহরণের পর থেকে পাঠকের সহানুভূতি রামের প্রতিই, রাবণের প্রতি নয়। তাই সে ভেবে দেখে না যে, সুশিক্ষিত সশস্ত্র বহুসংখ্যক রাক্ষসসৈন্য শুধু দু-ভাইয়ের ধনুর্বাণ ও বানরদের ভেঙে আনা গাছপাথরে পরাজিত হওয়াটা অবাস্তব ঘটনা। পাঠক চায় রাবণ পরাজিত হোক, রাম জিতুন। এবং যে কোনও উপায়ে সেটা সংঘটিত হলেই পাঠকের অন্তরাত্মা স্বস্তি পায়, কারণ জয় পরাজয়ের দুটো দিকই খুব পরিষ্কার। তাই পক্ষত্যাগী বিভীষণকেও বিশ্বাসঘাতক বলার আগে পাঠক মনে করে যেহেতু রামপক্ষ ন্যায়পক্ষ, রাবণপক্ষ অন্যায়ের, তাই বিভীষণের কাজটা শেষ বিচারে অন্যায় নয়, বরং তিনি অন্যায়কে বর্জন করে ন্যায়পক্ষ অবলম্বন করেছেন। গুহকের আতিথ্য প্রত্যাখ্যান, বালিবধ, সীতাপ্রত্যাখ্যান এবং শম্বুকবধ ছাড়া তার কোথাও নৈতিক সমস্যার বালাই নেই। ওগুলি খুবই মারাত্মক, গ্লানিকর অপরাধ, তাই অনেক কুতর্কের অবতারণা করতে হয়েছে সব কটি ক্ষেত্রেই। অন্য দিকে মহাভারত যদিও বিস্তর কুতর্কের প্রসঙ্গ টেনে এনেছে তার ভার্গব-প্রক্ষেপের অংশে, কিন্তু অপ্রক্ষিপ্ত মূল অংশে মহাভারত ঘটনা ও চরিত্রকে যে ভাবে বিন্যস্ত করেছে তাতে এর অন্তর্নিহিত বহু মৌলিক ও তাৎপর্যপূর্ণ দ্বিধাস্থান স্বতই উদ্ঘাটিত হয়েছে, পাঠক ন্যায়নীতি সম্বন্ধে তার অভ্যস্ত চিন্তা ও বোধের ক্ষেত্রে পরিপন্থী মূল্যবোধের সম্মুখীন হয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ও অস্থির। যে গ্রন্থ পাঠককে চিন্তার মধ্যে ঠেলে দিয়ে আজন্মলালিত বোধ ও বিচারকে পুনর্বিবেচনা করতে বলে, তার জনপ্রিয়তার সম্ভাবনা কম।

৫ আরণ্যকপর্ব; (২৪০:৬-৭)

মূল মহাভারত এক সময়ে শেষ হয়েছিল স্ত্রী পর্বে। এটি ছোট একটি পর্ব, এর মধ্যে থেকে দু-তিনটি বিষয় উপস্থাপিত করব। প্রথম, যুদ্ধ-শেষে রণক্ষেত্রে এলেন সধবা গান্ধারী— একশত তরুণী বিধবা পুত্রবধূকে নিয়ে। শতপুত্রের মৃতদেহের ছিন্নভিন্ন অংশ যুদ্ধক্ষেত্রে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। চারিদিক থেকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কুড়িয়ে জোড়া দিয়ে বধূরা নিজেদের স্বামীর দেহে অবয়ব বিন্যাস করছেন, সঙ্গে চলছে শত তরুণীর যুগপৎ বিলাপ। ক্রমেই ধৈর্য্যচুতি ঘটছে গান্ধারীর। ইতিমধ্যে ভীম এসে জানালেন যে, তিনি সত্যিই দুঃশাসনের রক্ত পান করেননি, ওষ্ঠে স্পর্শ করিয়েছিলেন মাত্র। যুধিষ্ঠির এসে ক্ষমা চাইলেন যুদ্ধের জন্য পুরো দায়িত্ব মেনে নিয়ে, গান্ধারীর অভিশাপ প্রার্থনা করলেন। মুখাবরণের ফাঁক দিয়ে গান্ধারী যুধিষ্ঠিরের পায়ের আঙুল শুধু দেখতে পেলেন, তাঁর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাতে সেগুলি কালো হয়ে গেল। দ্যূতক্রীড়া থেকে এবং অন্যত্রও ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের যে খানিকটা দায়িত্ব ছিল এই শ্মশান-রচনায়, তা প্রমাণিত হল। কিন্তু গান্ধারী জানতেন মূল অপরাধী কে। তাই কৃষ্ণকে বললেন, পাণ্ডব-কৌরবদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ছিল, এ যুদ্ধে সিংহাসন-লাভের স্বার্থ, তাই তাদের যুদ্ধ বোঝা যায়। কিন্তু কৃষ্ণই ছিলেন একমাত্র যাঁর সে রকম কোনও স্বার্থ ছিল না এবং যাঁর কথা শেষ পর্যন্ত দু'পক্ষই শুনত; চাইলে একা তিনিই এ যুদ্ধ বন্ধ করতে পারতেন— কিন্তু চাননি। সেটা এত বড় এক বিধ্বংসী অপরাধ যে, গান্ধারী তাঁকে অভিশাপ দিলেন: কুৎসিত উপায়ে কৃষ্ণের মৃত্যু হবে, যদুকুলের অনাথ বিধবারা কুরুবিধবাদের মতোই অসহায় আর্তনাদ করবেন।[৬] প্রথমত ধর্মপরায়ণা গান্ধারীর এ অভিশাপ দেওয়ার অধিকার ছিল, তাঁর সামনে ছিল তাঁর একশত বিধবা পুত্রবধূ এবং একশত পুত্রের শবদেহের ছিন্নভিন্ন অবয়ব। নৈতিক অধিকার তাঁর এসেছিল মর্মন্তুদ শোক থেকে; এই নিবার্য প্রলয় ও অসংখ্য স্বজনহত্যা নিবারণ না করবার পুরো দায় তিনি কৃষ্ণের উপর আরোপ করলেন। এর পরেও একটু কথা থাকে: গান্ধারীর অভিশাপবাণী যে ধর্মসম্মত, তার কী প্রমাণ? প্রমাণ এই যে, স্বল্পকালের মধ্যে এ অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল এবং প্রমাণ করে দিল কৃষ্ণেরই পুরো দায়িত্ব ছিল এই বিভীষিকাময় সর্বনাশের জন্য। পাণ্ডবের কাছে তাঁর একটি অভিযোগ ও পরে একটিমাত্র প্রার্থনা ছিল। অভিযোগ হল: 'দুটো অন্ধ বুড়োবুড়ির অবলম্বন একটা লাঠিও রাখলে না? একশোটা ছেলেকেই মেরে ফেলতে হল?'

অনেক পরে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের কাছে গান্ধারী ও তাঁর নিজের নামে বনে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে বলেছিলেন, রাজা ও রানি এই পুত্রহীন, অন্ধ, বৃদ্ধ বৃদ্ধা দু'জনেই তাঁদের পুত্রদের অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইছেন, আর ভিক্ষা চাইছেন বাকি জীবনের জন্য বনবাসী হওয়ার সম্মতি।[৭] এ দৃশ্যের তুলনা কমই আছে। কী প্রতিক্রিয়া হবে পাঠকের এখানে? এই দম্পতির মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র দেহে মনে অন্ধ, অন্ধ পুত্রস্নেহে বারবার বিসর্জন দিয়েছেন

৬. শল্যপর্ব; (৫৭.৪)

৭ স্ত্রীপর্ব; (২৫ ৩৯-৪২)

ন্যায়নীতিবোধ, কিন্তু বসনাবৃতনেত্রা গান্ধারী বাস্তবে তো চক্ষুষ্মতী ছিলেন এবং নৈতিক স্তরে আরও বেশি করেই, তাই বারবার গোপনে এবং প্রকাশ্যে ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন, দুর্যোধনকে ত্যাগ কর। দুর্যোধন যুদ্ধযাত্রার আগে তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে এলে তিনি শুধুই বলতেন, 'ধর্ম যেখানে, জয় সেখানে'। 'পুত্র জয়ী হও'— এ কথা কখনও বলতে পারেনি। এই দম্পতির মধ্যে নীতিগত গভীর পার্থক্য ছিল, কিন্তু এই দীন আর্তি মুহূর্তের জন্য পাঠককে ভুলিয়ে দেয় ধৃতরাষ্ট্রের বহু অন্যায় কর্ম এবং বহুতর অন্যায়কে সমর্থন ও প্রশ্রয়দান। যেন তিনি পুত্রশোক, বার্ধক্য, অন্ধত্ব, রাজপটে আসীন পাণ্ডব ভ্রাতাদের প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্যে বিদ্রূপ-ভর্ৎসনা ও বক্রোক্তি সহ্য করার এবং নিজ বাসভূমে পরবাসী হওয়ার দুঃখে, সিংহাসনের রাজমর্যাদা ও সম্মানের পরিবর্তে বর্তমানে প্রজার ভূমিকায় অবনমিত হয়ে বহু পূর্ব পাপ স্খালন করেছেন; নীরবে অনাদরে দূর অরণ্যে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে বাকিটুকু শোধ করে দেওয়ার অনুমতি ভিক্ষা চাইছেন। সমস্ত মহাকাব্য জুড়ে যিনি স্বয়ং দুষ্কৃতি এবং দুষ্কৃতকারীর প্রশ্রয়দাতা, তিনি সর্বগৌরব-রিক্ত অবস্থায় সর্বজনের কৃপাপ্রার্থীর ভূমিকায় অবতীর্ণ।[৮] কাজেই পাঠকের স্বভাবতই কিছু ধন্ধ থাকে। পূর্বের ধৃতরাষ্ট্রকে সে মার্জনা করে না ঠিকই, কিন্তু এখন? এ ধৃতরাষ্ট্রের অন্তরের কারাবাস তো কেউ লাঘব করতে পারবে না, কাজেই পাঠকের করুণা তাঁর প্রতি উদ্যত হবেই। তাই ভর্ৎসনার সঙ্গে মিশল করুণা, প্রতিক্রিয়া হল মিশ্র, দ্বিধাসংকুল।

আর গান্ধারী? পাঠকের মনে পড়ে, কুন্তির সন্তান যুধিষ্ঠির আগে জন্মগ্রহণ করলে শোকে ক্রোধে ক্ষোভে নিদারুণ পীড়িত গান্ধারী তাঁর গর্ভজাত শিলাস্বরূপ বর্তুলাকৃতি বস্তুটিকে বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়েছিলেন, হিতৈষীদের মধ্যস্থতায় নিবৃত্ত হন।[৯] দু-বছর পরে একশত কৌরব পুত্র জন্মায়। গান্ধারীর এই ক্রোধ ও ক্ষোভ সূচিত করে তাঁর রাজমাতা পদের জন্য দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। স্বামী যাঁর অন্ধ, নীতিবর্জিত, দুর্বলচরিত্র, কুমন্ত্রকদের পরামর্শে চালিত, তাঁর জীবনের শেষ বাসনা ছিল শতপুত্রপ্রসবিনী হয়ে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে রাজমাতার পদে আসীন থাকা। এ পদ তিনি পেয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু ন্যায়ের দৃষ্টিতে কুন্তির পুত্রই জ্যেষ্ঠ, ধৃতরাষ্ট্রের নয়; পাণ্ডুরই প্রাপ্য ছিল সিংহাসন এবং পরে পাণ্ডবদের। এই সমস্ত ব্যাপারটা নষ্ট হতে চলেছিল একটি কঠিন পিণ্ড প্রসব করে দু-বছর অণ্ডবৎ ভ্রূণগুলিকে লালন করার সম্ভাবনায়। তাই ওই সাংঘাতিক ক্ষুব্ধ মর্মান্তিক আক্রোশ। এ আক্রোশ নিজের ভাগ্যের বিরুদ্ধেই, কাজেই এ তাঁর পাপ নয়, ব্যর্থতাবোধ; বহুধাবঞ্চিতা নারীর নীরব আর্তনাদ। এ ছাড়া সারা জীবনে যিনি সত্যিই কোনও অন্যায় করেননি, আত্মজের অন্যায়কেও যিনি প্রশ্রয় দিতে পারেননি মাতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবণতা সত্ত্বেও, রাজবধূ ও রাজমাতার পদ যাঁর কাছে গুরুদায়িত্বের আসন ছিল বলে যিনি মাতৃসুলভ কোমলতাকে শাসন করেছেন নীতির মর্যাদা রাখতে, তিনি তো আগাগোড়াই সকলের সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন।

৮. স্ত্রীপর্ব; (১৪·২০-২১)
৯. আশ্রমবাসিক; (৯:৭-৯) (বঙ্গবাসী)

যুদ্ধের শেষে প্রাসাদের জীবনযাত্রা আবর্তিত হতে লাগল পাণ্ডবদের ঘিরে, কৌরব রাজমাতা প্রান্তবাসিনী হয়ে রইলেন তাঁরই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে যে স্বামীর সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘকালের গভীর বিচ্ছেদ ন্যায়বোধের স্তরে। তাঁর অন্তরের বনবাস শুরু হয়েছিল প্রাসাদের অভ্যন্তরেই, পরে সেটা বাস্তবায়িত হল।

বিদুর, সঞ্জয় ও গান্ধারী ছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের বিকল্প বিবেক; এঁদের এবং তৎকালীন রাজমাতা কুন্তিকে নিয়ে শুরু হল বনবাস, শেষ হল অগ্নিদাহে, মৃত্যুতে। বনগমনের প্রাক্কালে গান্ধারী সম্বন্ধে পাঠকের কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে? সেও এক মিশ্র অনুভূতি। চিরশ্রদ্ধার পাত্রী গান্ধারী দীন ভাবে বনবাসের অনুমতি চাইছেন। এতে পাঠকের মনে যে সহানুভূতি জাগে তার মধ্যে কোথাও একটা দীনতা ও করুণার সংশ্লেষ ঘটে।

এই স্ত্রীপর্বেই পঞ্চম অধ্যায়ে একটি উপাখ্যান আছে:

> এক ব্রাহ্মণ রাক্ষসবহুল এক বনে প্রবেশ করেন। সেখানে অনেক সিংহ, বাঘ, হাতি, চারিদিকে ঘুরছে। দেখে ব্রাহ্মণটির ভয়ে রোমাঞ্চ হল। দেখলেন চারিদিকে জালে ঢাকা এক বনভূমি তাকে এক নারী দু-হাতে বেষ্টন করে আছে। পাঁচমাথাওয়ালা পাহাড়প্রমাণ হাতিরা ঘুরছে। সেই বনে লতায় ঢাকা এক জলাশয়, তার মধ্যে এক কূপ। ব্রাহ্মণ আচমকা সেই কুয়োয় পড়ে গেলেন, ঝুলন্ত লতা ধরে ঝুলতে লাগলেন— মাথা নিচে, পা ওপরে এই অবস্থায়। কুয়োর পাড়ে এক প্রকাণ্ড হাতি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। ওই ঝুলন্ত শাখায় ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি। মৌচাক থেকে মধুর ধারা নিঃসৃত হচ্ছে। ওই ব্রাহ্মণটির মুখেও মধ্যে মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা মধু পড়ছে, পান করে তার অতৃপ্তিই বাড়ছে। মহাভারত বলছে, ওইখানেই মানুষের বেঁচে থাকার বাসনা প্রতিষ্ঠিত। এ দিকে যে-গাছের লতা ধরে মানুষটি ঝুলছে সেই গাছের শিকড়গুলো কেটেই চলেছে কিছু ইঁদুর, অর্থাৎ যে কোনও সময়ে গাছটা পড়ে যাবে, লতাগুলো ছিঁড়ে যাবে এবং মানুষটি কুয়োর নীচে পড়ে যাবে আছে বিষাক্ত সাপ। মানুষ সংসারে নিক্ষিপ্ত হয়ে এই ভাবেই বেঁচে থাকে।[১০]

এই প্রলম্বিত উপমাটি আছে স্ত্রীপর্বে, যেখানে রচনার এক স্তরে মূল মহাভারত সমাপ্ত হয়েছিল, অর্থাৎ মহাভারত জীবন সম্বন্ধে যা বলতে চায় তা এখানে বিধৃত। একবারও অস্বীকার করা হচ্ছে না যে জীবনে বিপদ, আশঙ্কা ও ভয়ের নানা কারণ আছে। অন্যত্র মহাভারত বলছে, 'শোকস্থান-সহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ।' ওপরে বিপুলকায় হাতি, মৌমাছির ঝাঁক, জালে ঢাকা জলাশয়ের মধ্যে এই কূপ; যে লতা ধরে ঝুলছে মানুষটি তার আশ্রয়স্থলে যে গাছ তার শিকড় কেটেই চলেছে ইঁদুররা; গাছ-লতা পড়ে গেলে অবলম্বনচ্যুত হয়ে মানুষটি পড়বে কুয়োর নীচে, যেখানে আছে বিষধর সাপ। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত পরিত্রাণের কোনও

১০ আদিপর্ব; (১০৭:১১)

উপায় নেই। অনিবার্য মৃত্যুর বহুবিধ সম্ভাবনা, যন্ত্রণার নানাবিধ উপাদান এই পরিবেশেই মানুষ জীবনে বেঁচে থাকে। কেন থাকে? কী তাকে বাঁচায়? ওই মৌচাক থেকে ঝরে পড়া ফোঁটা ফোঁটা মধু, যা পান করে তার কখনওই তৃপ্তি হয় না, কিন্তু যার জন্য লোলুপতা তাকে বাঁচিয়ে রাখে, জাগিয়ে রাখে পরবর্তী মধুবিন্দুটির প্রত্যাশায়।

এই মধু-র স্বরূপ প্রত্যেক জীবনে ভিন্ন, কোথাও তা কর্ম, কোথাও কোনও ক্ষেত্রে সাধনা, কোথাও কোনও মানবিক আদর্শ, কোথাও প্রেম, কোথাও বা অন্য কিছু। কিন্তু স্বরূপ যাই হোক, ওই মধু-বিন্দু তাকে তৃপ্তি দেয় না, অতৃপ্তিই বাড়িয়ে দেয়; তার ফলে সে চারিদিকের বিপৎসংকুল পরিস্থিতির মধ্যেও হাল ছেড়ে দেয় না। বেঁচে থাকতে প্রয়াসী ও বদ্ধপরিকর হয়। সংস্কৃত সাহিত্য এই বাঁচবার উদগ্র অনিঃশেষ বাসনাকে বলেছে 'জীবাতুকাম্যা'। ঋগ্বেদ থেকেই জীবাতু শব্দটির দেখা পাই, অর্থাৎ এই বোধটি বহু প্রাচীন। প্রাচীনতর মহাকাব্য *গিলগামেশ্*-এও অমৃতের সন্ধানে নায়কের সুদীর্ঘ বিপৎসঙ্কুল অভিযান এরই প্রতীক; এই 'জীবাতুকাম্যা'র।

স্ত্রীপর্বের এই সুদীর্ঘ উপমা-আখ্যানে মহাভারত মানুষের জীবনের পুনর্মূল্যায়ন করেছে। পাঠক এতে কী ভাবে সাড়া দেবে? মনে রাখতে হবে, এই রচনা উপনিষদের 'মোক্ষ' ও বৌদ্ধধর্মের 'নির্বাণে'র কল্পনার পরবর্তী। অর্থাৎ ওই সব চিন্তাকে পেরিয়ে এখানে মহাভারত তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত জীবন ও জীবনের তাৎপর্য ও 'জীবাতু' সম্বন্ধে উচ্চারণ করছে। 'জীবন মায়া' বলবার পেছনে যে নিস্পৃহতা তার নানা দিক এখানে সন্নিবিষ্ট— ওই বাঘ সিংহ হাতির দল, মৌমাছির ঝাঁক, অত্যন্ত ক্ষীণ অবলম্বন, ইঁদুরে যাকে এক সময়ে ছিন্নমূল করে দেবেই, অনিবার্য মৃত্যু কুয়োর নীচের সাপের মূর্তিতে এবং ওপরের শ্বাপদকুলের আক্রমণের সম্ভাবনায় প্রতিবিম্বিত। অতএব জীবনকে মায়া বলার প্রলোভনের বিস্তর হেতু এখানে উপস্থিত; অন্তিম মৃত্যুটি কোনও মতেই মায়া নয়, আর বিপদের সম্ভাবনাগুলির মধ্যে জীবনের নানা সংকট ও যন্ত্রণা প্রতিফলিত। এ সবই বাস্তব, কাজেই জীবন সম্বন্ধে যে অনীহা নানা দর্শন-প্রস্থানে উচ্চারিত হচ্ছিল এবং বহু মানুষকে আকৃষ্টও করছিল তার প্রতিস্পর্ধারূপে মহাভারতে জীবনের পুনর্মূল্যায়ন স্পষ্ট ভাবে অন্য এক মূল্যবোধ উপস্থাপিত করছে। জীবন বহুমূল্য; ওই মধুবিন্দুটি তার সম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করে না, কিন্তু নিত্যজাগ্রৎ রাখে। জীবনের ইহমুখীন এই স্বীকৃতি নেতিবাচক প্রস্থানগুলিকে প্রত্যাখ্যান করছে, যেগুলি শ্রেণিবিভক্ত সমাজে অত্যাচারিত সংখ্যাগুরু মানুষের জীবনে তখনই বেশ দৃঢ়মূল। কাজেই পাঠক জীবনের আধ্যাত্মিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বহুবিধ বিপদ, ভয়, শোক, আতঙ্ক যন্ত্রণাকে একান্ত মনে করে জীবনকে প্রত্যাখ্যান করে পরমার্থের, নির্বাণ বা মোক্ষের চেষ্টা করবে, নাকি এই মধুবিন্দুটি যেহেতু অলীক নয়, তাই 'জীবাতু'র মূল্যমানে প্রত্যয় রেখে সংগ্রামী মনোবৃত্তি নিয়ে বিপৎসংঘাতের সম্মুখীন হবে— এ দুটো সম্ভাবনা পাঠককে দ্বিধান্বিত করে। এ কাহিনিতে মহাভারত জীবনের সদর্থক দিককে অভ্যর্থিত করেছে। ঋগ্বেদের পরে এই প্রথম। হয়তো বেশ কিছু শতাব্দী পর্যন্ত; এর শেষ দৃঢ় পুনরুচ্চারণ পাই রবীন্দ্রনাথে— 'মরিতে

চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে'। দুটি আত্যন্তিক বিকল্পের এমন প্রত্যয়যোগ্য রূপায়ণ রামায়ণে কোথাও নেই; রামায়ণ জীবনের এত গভীর স্তরে মানুষকে নিয়ে যেতে পারেনি। সহজ জীবনে নিশ্চিন্ত প্রত্যয়ী মানুষ তাই যত সহজে রামায়ণে সাড়া দিতে পেরেছে, সংশয়সমাকুল মহাভারতে তেমন ভাবে কখনওই পারেনি।

অতিলৌকিকতা ও মানবিক সংশয়

স্ত্রীপর্বের পরে শান্তিপর্ব, মহাভারতের দীর্ঘতম অংশ। মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত অংশের যদি তিনটি স্তম্ভ থাকে তবে সেগুলি হল বনপর্ব, অনুশাসনপর্ব ও শান্তিপর্ব। এখানে ভীষ্মকে সুদীর্ঘকাল শরশয্যায় শুয়ে থাকতে হল: আসল কারণটা সূর্যের উত্তরায়ণে যাওয়া নয়, ততটা সময় না পেলে এতগুলি উপদেশবাণী ভীষ্ম দেবেন কখন? লক্ষণীয়, পাণ্ডব ভ্রাতাদের উদ্দেশ্যে সাধারণ ভাবে বলা হলেও শান্তিপর্বের বাণীর মুখ্য শ্রোতা যুধিষ্ঠির; ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে ধর্মশিক্ষা দিচ্ছেন ভীষ্ম। কেন? যুধিষ্ঠির রাজা হবেন, তাই। তা হলে শান্তিপর্বের 'রাজধর্ম' অংশটা বোঝা যায়। ধার্মিক রাজা হতে হবে, তাই মোক্ষধর্মও জানা দরকার। এমনি ভাবে নানা আনুষঙ্গিক বিষয় এতে জুড়েছে। কিছু বা তার অতিকথা, যেমন রাজার উৎপত্তি। কিছু বা কাহিনিনিষ্ঠ উপদেশ, যেমন আতিথ্য, দয়া, ইত্যাদি সম্বন্ধে কথা। কিছু বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রযোজ্য, যেমন রাজার কর্তব্য নিরূপণ। এর মধ্যে প্রসঙ্গ ছাড়াও নানা বিষয় জুড়েছে যেমন নারীনিন্দা, শূদ্রের সামাজিক স্থান, জ্যেষ্ঠভক্তি, ইত্যাদি।

এ বিষয়ে পাঠকের প্রতিক্রিয়া কেমন হয়? তুলনীয় অংশ রামায়ণে নেহাৎ-ই কম। প্রাসঙ্গিকতা সর্বত্রই আছে, দৈর্ঘ্যও স্বল্পতর। এখানে পাঠকের চিন্তাগত একটা বিভ্রান্তি আসে, কারণ বক্তা ভীষ্ম, শ্রোতা যুধিষ্ঠির। দুজনেই যখন ধর্মজ্ঞ, তখন এত বাগ্‌বিস্তার কেন? মৌর্যযুগের কাছাকাছি থেকে গুপ্তযুগের আরম্ভ পর্যন্ত আর্যাবর্তব্যাপী যে রাজ্য-সাম্রাজ্য স্থাপিত হচ্ছে তার নির্দেশক শাস্ত্র তো চাই। এই সেই শাস্ত্র। কাজেই যুধিষ্ঠির পরোক্ষ শ্রোতা, প্রত্যক্ষ শ্রোতা ওই দীর্ঘ আটশ বছরের বিবর্তনের মধ্যবর্তী কালের ও পরবর্তী কালের মানুষ। ফলে বহু পুরাতন ভাব পুনরাবৃত্ত হচ্ছে; বহু বিষয়ে, নির্দেশ কঠোরতর হচ্ছে; শ্রোতা ভেবে পাচ্ছে না এত শাস্ত্রকথা শাস্ত্র ছেড়ে মহাকাব্যে স্থান পায় কেন, মহাকাব্যের ধর্ম যে এতে ক্ষুণ্ণ হয়। বোঝাই যায়, এই সুদীর্ঘ শান্তিপর্ব একজনের রচনা নয়; বহু বিভিন্ন কবি-মনীষী ও অকবি শাস্ত্রকারের সমবেত প্রয়াসে এর সৃষ্টি। এবং এমন ক্ষেত্রে যা হয় তা মাঝে মাঝেই ঘটেছে: সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত কথাও ঢুকিয়ে দিয়েছেন দু-চারজন ব্যতিক্রমী রচয়িতা। তার একটি দুটি বলব।

যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্ম বলছেন, তীক্ষ্ণ বিষ কালসাপ, ক্ষুরের তীক্ষ্ণ ধার, বিষ ও নারী একই রকম প্রাণনাশক; আর যা-ই করো, যুধিষ্ঠির, নারীকে কদাপি বিশ্বাস কোরো না।[১] বক্তা চিরকুমার, ব্যক্তিগত ভাবে নারীর বিষাক্ততা বা মাধুর্য কোনওটাই তাঁর জানবার কথা নয় এবং বিপরীতে, শ্রোতা স্ত্রী-অভিজ্ঞ (এক পঞ্চমাংশের হলেও স্বামী এবং তাঁর অন্য স্ত্রী ছিল); এই চিরকুমারের উপদেশ না শুনে নারী সম্বন্ধে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে আসার, দৃঢ়তর ভিত্তি তাঁর থাকার কথা। এ অবস্থায় সমস্ত অংশটা হাস্যকর ও যথার্থই অপ্রযোজ্য, অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। পাঠকের কী প্রতিক্রিয়া হবে? ভীষ্মের প্রতি শ্রদ্ধা টলে যাবে। যুধিষ্ঠিরের নিষ্প্রতিবাদে এ কথা শোনা তো দ্রৌপদীর প্রতি প্রচ্ছন্ন অপমানে পর্যবসিত হয়। সমকালীন ও উত্তরকালীন পুরুষের মনকে নারী সম্বন্ধে বিষিয়ে দেওয়াই এর মুখ্য উদ্দেশ্য বলে প্রতীত হবে। এর কারণ, গুপ্তযুগ থেকে যে সমাজের ভিত্তিস্থাপন হচ্ছে, তার একটি মূলস্তম্ভ নারীর সামাজিক অবনমন এবং পুরুষের দ্বারা অবদমন। কিন্তু উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন, শরশয্যায় শুয়ে পিতামহ পরিণত বয়স্ক নাতিকে এই সব শিক্ষা দিচ্ছেন মৃত্যুর অনতিদূর থেকে— এতে একটা উদ্দেশ্য-উপায়ের বিরোধ পাঠককে ভারাক্রান্ত করে তোলে। এমনই বহু শ্লোকে শূদ্রের হীনতা, রাজার প্রতি প্রজার বশ্যতা, গুরুজনের প্রতি কনিষ্ঠের, পুরুষের প্রতি নারীর, দেবতার প্রতি মানুষের, নিয়তির সঙ্গে পুরুষকারের সম্বন্ধ— মৃত্যুপথযাত্রী অশীতিপর বৃদ্ধের এই সব কী পৌত্রের হাতে শেষ উত্তরাধিকার তুলে দেওয়ার যথার্থ নমুনা? উপায় ও উপেয়ের দ্বন্দ্ব থেকেই যায়, পাঠককে অনেকটা ব্যাকুল করে তোলে।

আগেই বলেছি, ভিন্ন ভিন্ন লেখনীর সৃষ্টি ভিন্ন অংশ। তাই এক জায়গায় প্রায় অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই সহসা ভীষ্ম বলেন, 'গোপন একট রহস্য তোমাকে বলি। যুধিষ্ঠির, মানুষের চেয়ে বড় কোনও কিছুই নেই।'[২] অর্থাৎ? দেবতাদের চেয়ে মানুষই বড়। এবং শুদ্ধ মানুষ হিসাবেই সে বড়। গুণী, জ্ঞানী, বীর, পণ্ডিত, যশস্বী মানুষ নয়, মানুষ বলেই মানুষ বড়। কত বড়? আবিশ্বচরাচরে সবচেয়ে বড়; সবচেয়ে উঁচুতে তার জায়গা। তা হলে এতক্ষণ যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গার মহিমা কীর্তন করা হল, তাঁদের জায়গা কোথায়? কোথায় আবার? ভীষ্ম তো সরাসরিই বললেন, মানুষের নিচে। কারণ মানুষ সৃষ্টির উন্নততম স্থানে আসীন। স্বভাবত, বলাই বাহুল্য, এই উক্তিতে পাঠক শ্রোতার মনে একটা ধন্ধ লাগে, তার চিরাভ্যস্ত ধারণাগুলি কেমন বিপর্যস্ত হয়ে যায়। সমস্ত রামায়ণে এমন বৈপ্লবিক উক্তি একটিও নেই। সেখানে আদি নায়ক রাম 'নরচন্দ্রমা' ছিলেন, যেমন সব মহাকাব্যের নায়করাই হন। কিন্তু মহাকাব্যটির জনপ্রিয়তার পরেই রাম বিষ্ণুর অবতারে পরিণত হন, অর্থাৎ মানুষের মর্যাদার ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয় দেবতার মহিমা। মহাভারতের শেষ সংযোজনে কৃষ্ণকেন্দ্রিকতা দেখা যায়; কিন্তু 'স্ত্রীপর্বে'-তে বিষ্ণুর অবতার সেই কৃষ্ণ, যিনি স্বয়ং ভগবান, এবং

১. স্ত্রী পর্ব ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়
২. শান্তিপর্ব; (৪০:১); অনুশাসনপর্ব; (৪৩:২৫)

'যতঃকৃষ্ণস্ততোজয়ঃযতোধর্মস্ততোজয়ঃ' এই সব বাণীতে যিনি ধর্মের সঙ্গে সমীকৃত, সেই কৃষ্ণকে যখন তাঁর অধার্মিক আচরণের জন্য অভিশাপ দেন মানবী গান্ধারী, তখন স্পষ্টতই কৃষ্ণ মানুষে পরিণত। মথুরার রাজা পাণ্ডবসখা কৃষ্ণ মহাভারতের মূল অংশে মানুষরূপেই ছিলেন; মহাকাব্যটি জনপ্রিয়তা অর্জন করবার পরে বিষ্ণু-কৃষ্ণভক্ত সম্প্রদায়ের পুরোহিত ভক্তরা এটিকে আত্মসাৎ করে এবং সাম্প্রদায়িক ইষ্ট সিদ্ধির জন্যে কৃষ্ণকে এর কেন্দ্রস্থলে বসায় এবং তখনকার কৃষ্ণ ভগবদগীতার বক্তা, দেবতা, বিষ্ণুর অবতার। একথা মনে রাখলে কৃষ্ণের দুটি চিত্রের ব্যাখ্যা মেলে। যখন মহাকাব্য পাণ্ডবসখা পার্শ্বচরিত্র, তখন তিনি সম্পূর্ণতই মানুষ; পরবর্তী প্রক্ষিপ্ত অংশে পুরো দেবতা।

এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে আদিপর্বের একটি উপকাহিনি অণীমাণ্ডব্যের কাহিনি। এটি মূল কাহিনির সঙ্গে অসম্পৃক্ত:

> ঋষি অণীমাণ্ডব্য মৌন অবলম্বন করে তপস্যা করছিলেন নিজের কুটীরে। কয়েকজন চোরকে নগররক্ষীরা তাড়া করতে তারা নিরুপায় হয়ে চুপি চুপি চোরাই মাল ঋষির কুটীরে রেখে পালিয়ে যায়। রক্ষীরা কুটীরে ঢুকে ঋষিকে জিজ্ঞাসা করে, লোকগুলো কোনদিকে গেল। কিন্তু ঋষি তখন মৌন অবলম্বন করে আছেন তখন, কাজেই উত্তর দিলেন না। রক্ষীরা চোরাই মাল কুটীরে পেয়ে ঋষিকেই চোর সাব্যস্ত করে রাজদ্বারে বিচার চায়। রাজা বলেন তাঁকে শূলে দিতে। শূলে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে অণীমাণ্ডব্য ধর্মকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করেন, নির্দোষ হলেও কেন তাঁর এই মর্মান্তিক মৃত্যু। ধর্ম বলেন, শৈশবে তিনি একটি কীটের শরীরে একটি কাঁটা প্রবেশ করান, এ তারই প্রায়শ্চিত্ত। তখন অণীমাণ্ডব্য ধর্মকে উদ্দেশ করে অভিশাপ দিয়ে বলেন, অজ্ঞান বালকের লঘু পাপে এই গুরুদণ্ড বিধান করার অপরাধে ধর্মকে মর্তে জন্মাতে হবে শূদ্রযোনিতে। ধর্ম শূদ্ররূপে অবতীর্ণ হলেন, বিদুর রূপে।[৩]

এটি একটি বৈপ্লবিক উপাখ্যান: শ্রোতা পাঠকের আজন্মলালিত বিশ্বাসের মূলে আঘাত করে অভিশাপ। প্রথমত ধর্ম স্বয়ং দেবতা, তাঁর পক্ষে কোনও অন্যায় করাটাই অকল্পনীয়। দ্বিতীয়ত, দেবতা যা-ই করুন না কেন, একজন মানুষ তাঁকে কী ভাবে অপরাধী সাব্যস্ত করে দণ্ড দেবে, অভিশাপ দেবে? এবং আরও বিস্ময়কর কথা, সেই অভিশাপ ফলে যাবে? এখানেও একজন নির্দোষ সৎ মানুষ দেবতার বিচারক ও দণ্ডদাতা হয়ে দেবতার ওপরে উন্নীত হলেন।

এমনই আর একটি উপকাহিনি আছে:

> যমরাজের দূতেরা এক ব্যক্তিকে পরলোকে নিয়ে গেল; তাকে দেখে যম বললেন, 'ভুল হয়ে গেছে। এরা অর্থাৎ যমদূতেরা নামসাদৃশ্যে ভুল লোককে ধরে এনেছে।' পরে লোকটির কাছে মার্জনা ভিক্ষা করে তাকে মর্তে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।[৪]

৩. শান্তিপর্ব; (২৮৮:২০)
৪. আদিপর্ব; (১০১:২৫, ২৭)

তা হলে দেবদূতরা ভুল করে মৃত্যু ঘটায়? এ সব কাহিনিতে পাঠকের চিরাচরিত বিশ্বাসগুলি চূর্ণ হয়, তাকে নতুন করে ভাবতে হয়: কেন এ কাহিনি, এর তাৎপর্য কী?

তাৎপর্য আছে বই কী। যে মহাভারতে ভীষ্ম অসংখ্য প্রচলিত কুসংস্কারের প্রশংসা করতে করতে হঠাৎ যুধিষ্ঠিরকে বলে ওঠেন, মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছুই নেই, সেই মহাভারতকারেরেই তো বুকের পাটা থাকবে এত বড় একটা প্রকাণ্ড লোকক্ষয়কারী যে পাপ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, তার সমস্ত দায়িত্ব ধর্মরূপী কৃষ্ণের ওপরে চাপিয়ে দেওয়ার, এবং সেটা ফলিয়ে দিয়ে এটা প্রতিপন্ন করা যে ওই ধর্ম-কৃষ্ণের স্থান অভিশাপদাত্রী এক মানবীর নিচে। এই মহাভারত যখন দেবতা অণীমাণ্ডব্যকে দিয়ে ধর্মকে অভিশাপ দেওয়ায় মানুষ, তখন সে কি বলে না যে সংসারটা কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন দেবতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, এখানে বহু অনর্জিত তাপ ভোগ করতে হয় মানুষকে, যদি বিধাতা কেউ থাকে তবে সে বিধাতা একান্তই খামখেয়ালি? তাই এমন মৃত্যু প্রায়শই ঘটে, যার ব্যাখ্যা মেলে না; যমদূতের ভ্রান্তি সেই ব্যাখ্যা। এখানে সব সময় ভালর জয় হয় না। দেবতা থেকে থাকলেও নয়, বরং সেই দেবতাই দায়ী শাস্তি-পুরস্কারের বৈষম্যের জন্য। এ বৈষম্য তো মানুষকে প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় এমন মর্মন্তুদ উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে জানতে হচ্ছে যার কোনও ব্যাখ্যা সে কখনও খুঁজে পায়নি; পায় না, পাবেও না। মহাভারত এই সব উপাখ্যানের মধ্যেই বিভ্রান্ত সেই মানুষকে তো বলছে, 'এভাবে অভিজ্ঞতার অর্থ খুঁজোনা, কোথাও মিলবেনা হিসেব।' এবং প্রচলিত বিশ্বাসভিত্তি বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও মানুষ তো এই সব কাহিনির অন্তর্নিহিত তত্ত্বের মধ্যে দিয়েই পৌঁছেছে অর্থ খোঁজা থেকে মুক্তিতে, দেখতে পাচ্ছে সংসারের কোনও ন্যায়নিষ্ঠ অধিকর্তা নেই। কাজেই মানুষেরই ওপরে সেই দায়িত্ব বর্তায়: রূপনারাণের কূলে নিরুত্তর এই জীবনজিজ্ঞাসার সামনে দাঁড়িয়ে, অন্যায়ের প্রতিকারের দায়িত্ব আপন হাতে তুলে নেওয়ার।

সমগ্র রামায়ণে এমন কোনও উপাখ্যান নেই যা মানুষের গভীরতম বিশ্বাসের মূলে এমন ধাক্কা দেয়। কাজেই রামায়ণের পাঠক যত তার.পূর্ব প্রত্যয়গুলির সমর্থন খুঁজে পায় মহাকাব্যে, ততই কাব্যটি তার সন্তোষ ও প্রশংসা অর্জন করে। সেখানে মহাভারতের পাঠককে প্রত্যয়ের প্রান্তে এসে সম্মুখীন হতে হয় বারংবার। সংশয়ের এক অতল কালো গহ্বরের আতঙ্কের প্রথম পর্যায়ে তার অস্বস্তি ও বিরক্তি জন্মায়, মহাকাব্যটি এ ভাবে তার বিশ্বাসের অবলম্বন কেড়ে নেয় বলে। যদিও যথেষ্ট ধৈর্য ও বিবেচনা নিয়ে যাচাই করলে সে আপাতত প্রত্যয়-ধ্বংসের ওপারে অন্য একটি গভীরতর প্রত্যয়ের ভূমি ধীরে ধীরে খুঁজে পায় ও উপলব্ধিতে পৌঁছতে পারে, যেখানে জীবনের বহু জটিলতার অন্যতর ব্যাখ্যা মেলে।

কৌরবরা নিঃশেষ হলে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে যুধিষ্ঠিরের অবিসংবাদিত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু তখন যুধিষ্ঠির সিংহাসনে অনীহা প্রকাশ করে কনিষ্ঠদের একে একে রাজা হতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু ভ্রাতৃহত্যা-স্বজনহত্যার দরুন যে অপরাধ-বোধ যুধিষ্ঠিরকে পীড়া দিচ্ছিল তা অন্যেরাও অনুভব করছিলেন। এবং জ্যেষ্ঠ যেখানে বিমুখ, সেখানে অন্যরা তা গ্রহণ করা সমীচীন মনে করলেন না। শেষ পর্যন্ত ব্যাস পরামর্শ দিলেন, পাপবোধ থেকে

নিষ্কৃতি পেতে গেলে পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞ করা উচিত। তার পরে শুদ্ধচিত্ত যুধিষ্ঠির অভিষিক্ত হয়ে রাজত্ব করতে পারবেন।[৫] পাঠকের অবাক লাগে এই ভেবে, যে, সমস্ত যুদ্ধটা তো সিংহাসনেরই জন্যে। বহু স্বজন-বন্ধু হত্যার পরে সেই সিংহাসনে বসতে পাণ্ডবদের এত দ্বিধা কীসের? তাঁরা ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ করে নিজস্ব অধিকার আদায় করাই ক্ষত্রিয় ধর্ম, তবু যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে যুধিষ্ঠিরের কী আকুতি যুদ্ধ বন্ধ করার জন্যে, অর্জুনের কী ঘোর আপত্তি আত্মীয়বন্ধু হত্যায়! ক্ষত্রিয় ক্ষাত্রধর্ম পালন করতে এত দ্বিধা করে কেন? এই দ্বিধারই শেষতম প্রকাশ আশ্বমেধিক পর্বে। ব্যাস উপায় নির্দেশ না করলে কী করতেন পাণ্ডবরা? এত কষ্টে অর্জিত সিংহাসন ছেড়ে বানপ্রস্থে যেতেন? কতকটা যেন অসহিষ্ণু বোধ করে পাঠক। কিন্তু এই দ্বিধার পশ্চাতে আছে ক্ষাত্র-ধর্মেরও ওপরে যার স্থান, সেই মানবধর্ম। গ্রন্থকার দেখাতে চাইছেন, হস্তিনাপুরের সিংহাসনে শেষ পর্যন্ত যাঁরা এলেন তাঁরা শুধু ক্ষত্রিয় নন, পুরোপুরি মানুষও। বর্ণধর্মকে পেরিয়ে তাঁদের দৃষ্টি পৌঁছেছে এমন এক স্তরে যেখানে তাঁদের এই অনুতপ্ত বৈরাগ্যই তাঁদের যথার্থ অধিকার দিচ্ছে রাজত্ব করবার। উপনিষদের সেই, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' তাঁরা অনুভব করেছেন বলেই এই মহতী দ্বিধা, যা তাঁদের মহনীয়তায় মণ্ডিত করেছে।

মহা ধুমধাম করে অশ্বমেধযজ্ঞ হয়ে গেল; যুধিষ্ঠিরের অপ্রতিহত প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হল; বহু দূরদূরান্তের রাজাদের আনুগত্য নিশ্চিত হল; কৌরবদের অনুগতরা বিদ্রোহ করার সাহস হারাল; শুরু হল পাণ্ডব রাজত্ব। রামায়ণে রামের রাজত্ব উত্তরকাণ্ডে খুব ঘটা করে বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে রামরাজ্যকে ধর্মরাজ্য বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সে রাজ্যে একটি ব্রাহ্মণ পুত্রের অকাল মৃত্যুর মূল্য শোধ করেছে শূদ্র শম্বুক, এবং নিরপরাধা এক নারী সীতাকে বারংবার অকারণে অপমান ও প্রত্যাখ্যান সহ্য করতে হয়েছে। অবশ্য, উত্তরকাণ্ডে সুর নেমে এসেছে, গতানুগতিক বর্ণনা এবং শূদ্র ও নারীর ওপর অত্যাচার ছাড়া কোনও কিছুই এখানে পাঠকের চিত্তকে প্রভাবিত করতে পারে না। মহাভারতের অশ্বমেধ যজ্ঞের পরেও সুর নেমে এসেছে। আশ্রমবাসিক পর্বে কুন্তি ও বিদুরকে নিয়ে বৃদ্ধ রাজদম্পতি ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী বনে গেলেন এবং একটি দাবানলে প্রাণ ত্যাগ করলেন।[৬] মৌষল পর্বে আকস্মিক, অর্থাৎ মূল কাহিনির সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে অসম্পৃক্ত একটি ঘটনা ঘটে, তার আকস্মিকতাই তাকে খানিকটা কাহিনিগত বৈচিত্র্য দেয়।

এখানে শুনি একদিন বিশ্বামিত্র, নারদ ও কম্বমুনি যদুরাজ্যে বেড়াতে এলেন কৃষ্ণের ভাই সারণ ও আরও দু-চারজনের কী দুর্মতি হল, তারা সাম্বর পেটের ওপরে এক মুষল রেখে কাপড় বেঁধে সেটা অদৃশ্য করে তাকে স্ত্রীবেশে সাজিয়ে মুনিদের সামনে এনে বললে 'এ কৃষ্ণের এক ভাইয়ের স্ত্রী, সন্তানসম্ভবা। এ কী প্রসব করবে পুত্র না কন্যা, তা আপনারা

৫. আশ্বমেধিকপর্ব; ৭১ অধ্যায়

৬. আশ্বমেধিকপর্ব; (৩:৪, ৯, ১০)

ধ্যানযোগে জেনে বলে দিন।' তখন মুনিরা স্পষ্টই বুঝতে পারলেন, তাঁদের ঠকাবার উদ্দেশ্যে এরা এই ছলনার অবতারণা করেছে। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, তিন মুনিই অভিসম্পাত দিয়ে বললেন, 'এ একটি মুষল প্রসব করবে, এবং তার দ্বারা সমগ্র যদুকুল ও বৃষ্ণিকুল ধ্বংস হয়ে যাবে।' বলে তাঁরা সেখান থেকে চলে গেলেন।

সত্যিই সাম্ব একটি মুষল প্রসব করল। কংসের পিতা রাজা উগ্রসেন সমস্ত ঘটনা শুনে অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে মুষলটিকে বালির মতো চূর্ণ করে সমুদ্রের জলে ফেলে দিতে বললেন এবং রাজ্যের সকলকে সুরাপান করতে নিষেধ করলেন। তখন আকাশে অন্তরীক্ষে ও পৃথিবীতে নানা দুর্নিমিত্ত দেখা দিল। কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র আকাশে উঠে মিলিয়ে গেল, তাঁর রথের ঘোড়ারা সমুদ্রের ওপর দিয়ে চলে গেল। তাঁর ও বলরামের ধ্বজা দুটি আকাশে উঠে নিশ্চিহ্ন হল। কৃষ্ণ বললেন কুরুবংশ ধ্বংস হওয়ার আগেও চারদিকে এ ধরনের নানা দুর্লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। কয়েকজন যদু ও বৃষ্ণি বংশীয়েরা অভব্য আচরণ করতে লাগল ও কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের সময়ে ও সৌপ্তিক পর্বে বর্ণিত যে যা অন্যায় করেছেন তাই নিয়ে সাত্যকি ও কৃতবর্মা পরস্পরকে দোষারোপ করতে লাগলেন। উচ্ছিষ্ট বাসন নিয়ে ভোজবংশীয় ও অন্ধকবংশীয়রা পরস্পরকে আক্রমণ করতে লাগলেন। এ ভাবে প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকি মারা গেলেন। এদের অশালীন ও হিংস্র আচরণে ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ একমুঠো এরকা-তৃণ (নলখাগড়ার মতো) ছিঁড়ে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি লোহার মুষলে পরিণত হল এবং তিনি তা দিয়ে সামনে যাকে পেলেন তাকেই মারতে লাগলেন। তখন অন্যরাও, ভোজ, অন্ধক ও বৃষ্ণি বংশের লোকেরাও লৌহমুষলে পরস্পরকে আঘাত করতে লাগলেন। কৃষ্ণের ছেলে, নাতি সকলে তাঁর সামনেই পরস্পরের এই উন্মত্ত আঘাত প্রত্যাঘাতে মারা গেলেন— সাম্ব, প্রদ্যুম্ন, গদ, চারুদোষ্ণ, অনিরুদ্ধ সকলেই। বহু লোক মারা গেলে পর, কৃষ্ণের সারথির পরামর্শে তাঁরা বলরামের কাছে এলেন; দেখলেন অনন্তনাগ তাঁর শরীর থেকে নিঃসৃত হয়ে সমুদ্রে চলে গেল এবং বলরাম দেহত্যাগ করলেন। দেখে কৃষ্ণ কিছু দূরে গিয়ে যোগাসীন হলেন। দূর থেকে জরা নামক এক ব্যাধ মৃগভ্রমে একটি শর নিক্ষেপ করলে তা কৃষ্ণর পায়ে বিদ্ধ হয় এবং কৃষ্ণ প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁর পূর্ব নির্দেশ অনুসারে হস্তিনাপুরে খবর গেল। অর্জুন এলেন যাদব ও বৃষ্ণিবংশের নারী, বৃদ্ধ ও শিশুদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে। পথে আভীররা তাঁদের আক্রমণ করলে অর্জুন তাঁর গাণ্ডীবে শরারোপ করলেন, কিন্তু কোনও দিব্যাস্ত্রের কথাই মনে আনতে পারলেন না। ফলে আভীররা নারীদের হরণ করল, বহু নারী নিজের ইচ্ছেতেই অপহারকদের সঙ্গে গেলেন। অল্প ক'জন নারীকে নিয়ে অর্জুন হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন।[৭]

এই কাহিনি যদি পাঠক অভিনিবেশ নিয়ে পড়েন তবে অনেকগুলো ঘটনায় তাঁর ধোঁকা লাগে। প্রথম ঋষিদের প্রতারণা করার উপাখ্যানটি কাহিনির দিক থেকে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। ঋষিশাপই যদি এর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে তাও বাহুল্য, কারণ যদু-বৃষ্ণি (কৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশের

৭. আশ্রমবাসিকপর্ব; (৪৫:৩৪)

ছিলেন) ধ্বংসের অভিশাপও একাদশ ('স্ত্রী') পর্বে গান্ধারীই দিয়েছিলেন, তবে দ্বিতীয়বার এই নেহাৎ শিশুসুলভ কাহিনির দ্বারা কী প্রতিপাদিত হল? নারীর শাপ ফলতে পারে না, তাই কি ঋষির শাপ প্রয়োজন হল? গান্ধারী সমস্ত জীবনই যে কোনও ঋষির মতোই সংযত ও ধর্মপরায়ণ, কিন্তু নারী উনমানব, তাই কি পুরুষ অভিশপ্তার প্রয়োজন? পাঠকের কাছে ওই স্ত্রীপর্বের প্রবল গাঢ় সংবেদনাময় পরিস্থিতিতে গান্ধারীর শাপের যে আবেগ-ঘন আবেদন আছে, এ ছেলেখেলায় তা কোথায়? পাঠক কীভাবে গ্রহণ করতে পারেন এ নিষ্কারণ দ্বিরুক্তিকে? তার পর, যে সব অতিলৌকিক ঘটনা এখানে অতি দ্রুত পর পর ঘটে চলেছে সেগুলি মহাকাব্যে গম্ভীর পরিণতির পরে তুঙ্গবিন্দু থেকে একটি করুণ ও হাস্যকর অবপতন। কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র ও গরুড়ধ্বজ আকাশে মিলিয়ে যাওয়া এবং বলরাম দেহত্যাগ করলে কৃষ্ণের যোগাসনে বসে দেহত্যাগ এক ধরনের কর্তব্যচ্যুতি, কারণ অর্জুন না আসা পর্যন্ত তাঁর নিজের ষোলো হাজার স্ত্রী এবং রাজ্যের বহু নারী, শিশু, বৃদ্ধ এদের কোনও ব্যবস্থাই তিনি করলেন না।

আগেই বলেছি শান্তিপর্ব থেকে মহাকাব্যের সুর নেমে এসেছে। প্রক্ষিপ্ত মৌষল পর্বে এই অবক্ষয়ের প্রকৃতি হল যাকে পূর্বেই অনিবার্য ভবিতব্য বলা হয়েছে তাকে এখানে কতকগুলি অতিলৌকিকের মধ্যে দিয়ে ঘটানো হচ্ছে। ধ্বজা, চক্র বাদ দিলেও যে কৃষ্ণ থাকেন তাঁর কি কোনও শক্তিই ছিল না আসন্ন যদুবৃষ্ণি-কুলক্ষয় নিবারণ করবার? তখনও কিন্তু তিনি অলৌকিক বিষ্ণু-অবতার, কারণ জরা'র শরে দেহত্যাগ করবার পর তাঁর চতুর্ভুজ মধুসূদন মূর্তি দেখানো হয়েছে।[৮] এ সবে পাঠকের খটকা লাগে এবং এই খটকাকে অতিক্রম করবার কোনও সূত্র মহাকাব্যে নেই। কাজেই ঋষিশাপ থেকে আরম্ভ করে অর্জুনের দিব্যাস্ত্র বিস্মরণ পর্যন্ত একাদিক্রমে যে সব অলৌকিক অনুপুঙ্খ বিবৃত হয়েছে তার যোগফল হল কৃষ্ণ, বলরাম ও অর্জুন ধাপে ধাপে নিষ্ক্রিয় ও নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছেন। শুধু পাঠকের স্বস্তি থাকে কোথাও এক ধরনের ঋণশোধের বোধে। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সমেত সমগ্র কুরুকুল ও বিস্তর পাণ্ডব ও পাণ্ডবপক্ষীয় বিস্তর বীরের প্রাণহানির এ যেন এক ধরনের প্রতিশোধ। কুরুকুল ও পাণ্ডবকুলের প্রতিশোধে যদু বৃষ্ণি ভোজ অন্ধক কুলের ধ্বংস। এবং এ উপসংহারে সুর এত নেমেছে যে কোথাও শৌর্য, উত্তেজনা, ধর্মযুদ্ধ, ন্যায়-প্রতিষ্ঠা, কোনও বৃহৎ ভাবের আভাসমাত্র নেই, শুধু অত্যন্ত রূপকথা-সুলভ অতিলৌকিকের ব্যবহার একটা অনিবার্য অবক্ষয় ঘটিয়ে তোলার জন্য।

কেমন এমন হল? পাঠক ধীরে ধীরে উপলব্ধি করে মহাকাব্যের সঙ্গে এ অংশের কোনও আত্যন্তিক যোগ নেই। বলরাম, কৃষ্ণ, অর্জুন, সবাই ফুরিয়ে গেছেন; তাই বীরের আর অস্ত্র লাগে না, তৃণই মুষল হয়ে ওঠে এবং নিষ্কারণ পারস্পরিক হত্যাকাণ্ড চলে। বাপ ছেলেকে মারে, ভাই ভাইকে। এ কেমন হননলীলা? বীরের উন্মাদনা এতে নেই। আছে অভিশপ্তের

৮. মৌষলপর্ব; (৮:৬৫, ৬৬, ৬৮)

উন্মত্ততা। এ যেন প্রকারান্তরে বলছে, অস্ত্র থাক আর নাই থাক, জিঘাংসা আছে। হঠাৎ যেন মনে হয়, অতবড় আঠারো দিনের ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধটাও এক অর্থে অমনই বিরাট এক ভ্রাতৃহনন পর্ব। মৌষলপর্বে একটা তীব্র জিঘাংসার ফলে ঘটল একটা ব্যাপক অপচয়। ছোট এই পর্বটি সহসা প্রতীকী হয়ে ওঠে: মহাকাব্যের যুদ্ধও তো তাই-ই। এখানে ঋষিদের প্রতারণা দিয়ে শুরু। ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন, কর্ণ ও শকুনি মিলে বারবার অক্ষক্রীড়ায় প্ররোচিত করেন যুধিষ্ঠিরকে এবং দ্যূতক্রীড়ায় স্পষ্ট প্রতারণা দিয়ে শকুনি যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করে। সেই প্রতারণাকে অবলম্বন করে নেমে এল ন্যায়ধর্মের অভিশাপ, সমগ্র কুরুকুল প্রায় ধ্বংস হয়ে গেল। মৌষলপর্ব ক্ষুদ্র পরিসরে প্রতিফলিত করেছে বৃহত্তর পরিসরের প্রতারণা ও মহাবিনাশ। যুদ্ধের পূর্বে যতক্ষণ পর্যন্ত মানবিকতা ছিল, যুধিষ্ঠির আচার্যদের পায়ে পড়েছেন যুদ্ধ থামাবার জন্য, অর্জুন গাণ্ডীব ত্যাগ করে যুদ্ধে প্রবল অনীহার যুক্তি দিয়েছেন। কৃষ্ণ 'যুক্তি' জালে অর্জুনকে পরাজিত করেছেন। ওর মধ্যে কোথাও একটা গভীরতর অযৌক্তিকতা পাঠক উপলব্ধি করেন। মৌষল পর্ব দুর্বল রচনা হলেও এই বোধটা যুদ্ধ, বর্ণধর্ম ও জীবনধর্ম সম্বন্ধে পাঠককে ক্রমে ক্রমে সচেতন করে একটা অস্থিরতায় পৌঁছে দেয় এবং সেই পরিমাণেই তার সার্থকতা।

দেবতা না মানুষ?

মহাভারতের মতো গ্রন্থিল মহাকাব্যটির সুর অনেকটাই খাদে নেমে এসেছে শেষের দুটি অংশ— 'মহাপ্রস্থান' ও 'স্বর্গারোহণ' পর্বে, কিন্তু পুরোপুরি নামেনি, মাঝে মাঝে উঁচু পর্দাতেও উঠেছে। মৌষলপর্বে অর্জুনের কাছে যদুকুল ধ্বংসের বিবরণ শুনে যুধিষ্ঠিরের মনে একটা বৈরাগ্য এল, অর্জুনেরও কৃষ্ণের বিরহে কষ্ট এবং কৃষ্ণের শেষ ইচ্ছা— তাঁর রাজ্যের নারীদের রক্ষা করা— রাখতে না পারার জন্যে মর্মান্তিক যাতনা হল। যুধিষ্ঠির বললেন 'কাল' আমাকে আকর্ষণ করছে। আমি আর সংসারে থাকব না।[১] অর্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীরও মনে একই রকম বৈকল্য ও ঔদাসীন্যের উদয় হল; সকলেই সংসার ছেড়ে যেতে চাইলেন। যজ্ঞ করে অগ্নিকৃত্য শেষ করে, ব্রাহ্মণভোজন করিয়ে, সব সম্পত্তি ব্রাহ্মণদের দান করে, বল্কল ধারণ করে তাঁরা পরিব্রজ্যা নিলেন। পরীক্ষিৎ নাবালক, তার শিক্ষার ভার কৃপাচার্যকে দিয়ে যুধিষ্ঠির বললেন, এর পুত্র রাজা হবেন। ততদিন ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যাগর্ভজাত সন্তান যুযুৎসুকে রাজত্ব করতে বললেন। সকলে বল্কলধারণ করে সমবেত প্রজাদের নিষেধ ও রোদন উপেক্ষা করে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক ঘুরে উত্তরের দিকে এগোলেন— পাঁচ ভাই ও দ্রৌপদী; একটি কুকুরও পথ থেকে তাঁদের সঙ্গ নিল। অগ্নিদেব এসে অর্জুনকে বললেন, তিনি যেন তাঁর গাণ্ডীব ধনু, যা বরুণের কাছ থেকে অর্জুনের জন্যে অগ্নি সংগ্রহ করেছিলেন, সেটি যেন অর্জুন বরুণকে প্রত্যর্পণ করে মহাপ্রস্থানে যান। শুনে অর্জুন গাণ্ডীব ধনুটি জলে ফেলে দিলেন।[২]

পথ চলতে চলতে হঠাৎ পড়ে গেলেন দ্রৌপদী; ভীম যুধিষ্ঠিরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন দ্রৌপদীর অর্জুনের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল, সেই পাপে এই মৃত্যু। এর পরে নকুল— তাঁর প্রাজ্ঞতার অহংকারের জন্যে; সহদেব— তাঁর রূপাভিমানের জন্যে; অর্জুন— এক দিনে সব শত্রু বিনাশ করবেন এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করতে পারার জন্যে; এবং অবশেষে ভীম— তাঁর ভোজনপ্রিয়তার জন্য প্রাণ হারালেন। একা যুধিষ্ঠির ও তাঁর

১. মৌষলপর্ব; (৫:২২-২৫)

২. মহাপ্রস্থানিকপর্ব; (১:৩,৪)

সঙ্গী কুকুরটি স্বর্গের দ্বারে পৌঁছতে দেবদূত কুকুরটি ফেলে রেখে যুধিষ্ঠিরকে সশরীরে স্বর্গে যেতে আহ্বান করলেন। যুধিষ্ঠির রাজি হলেন না, বললেন নিষ্কারণে বিশ্বস্ত সহযাত্রীকে পরিত্যাগ করতে পারবেন না। তখন দেখা গেল কুকুর স্বয়ং ধর্ম। স্বর্গে পৌঁছে যুধিষ্ঠির ভাইদের ও দ্রৌপদীকে দেখতে চাইলেন।[৩]

শেষতম পর্ব স্বর্গারোহণ। যুধিষ্ঠির প্রথমে দেখতে পেলেন কৌরব বীরদের। বিস্ময় প্রকাশ করলে নারদ বললেন যাদের পাপ বেশি পুণ্য কম, তারা আগে স্বর্গ ভোগ করে নরকে যায়। পুণ্যবান আগে নরকে যায়, তাই যুধিষ্ঠির নরকে যাতনাক্লিষ্ট ভাইদের ও দ্রৌপদীকে দেখতে পেলেন। যুধিষ্ঠির আসতেই নরকবাসীরা সকলে একবাক্যে তাঁকে অনুরোধ করলে যেন তিনি সেখানে অপেক্ষা করেন; কারণ নরকের দুঃসহ যন্ত্রণা, উৎকট পূতিগন্ধ, নানা রকম উৎপীড়নের কাতরোক্তি এ সবই যুধিষ্ঠির আসা-মাত্রই থেমে গেল। আলোকময় পরিবেশ, সুগন্ধ বায়ু ও শ্রুতিসুখকর ধ্বনিতে নরকবাসীরা তাদের যন্ত্রণা ভোগ থেকে পরিত্রাণ পেল। তখন নরকবাসীরা সকলে বিশেষ ভাবে যুধিষ্ঠিরকে অনুনয় করতে লাগলেন যেন তিনি সেখানেই থাকেন, কারণ তিনি আসাতে তাঁদের যন্ত্রণার লাঘব হয়েছে। যুধিষ্ঠির দেবদূতকে দেবতাদের জানাতে বললেন যে, তিনি ওইখানেই থাকবেন, যন্ত্রণাকাতর নরকবাসীদের আরাম দিতে। এর পর দেবতারা এসে যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে নিয়ে গেলেন। পথে স্বর্গের গঙ্গায় অবগাহন করে মানবদেহ ত্যাগ করে দিব্য শরীর ধারণ করে স্বর্গে এলেন। দেখলেন, তাঁর ভাইরা, দ্রৌপদী ও কৃষ্ণ সেখানে আছেন। শুনলেন, স্বয়ং লক্ষ্মী দ্রৌপদীরূপে মর্তে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এর পরের অংশ অপ্রাসঙ্গিক— ফলশ্রুতি অংশ।[৪]

মহাপ্রস্থান ও স্বর্গারোহণ অংশে বেশ কিছু ব্যাপারে পাঠকের সাড়া দ্বৈধতাকে স্পর্শ করে। মৌষল পর্বের শেষাংশে ও মহাপ্রস্থানের প্রথমাংশে দেখি, কৃষ্ণের মৃত্যু, যদুকুলধ্বংস, অর্জুনের গাণ্ডীব ধনু প্রত্যর্পণ, ইত্যাদির মধ্যে বীরদের ক্ষত্রিয়কৃত্য যেন ফুরিয়ে গেল। নিরস্ত্র ক্ষত্রিয়ের কী পরিচয়? এখন তাঁরা বানপ্রস্থী, কাজেই যজ্ঞকর্ম বা ক্ষাত্রকর্ম থেকে মুক্ত। কিন্তু বানপ্রস্থেও তাঁরা রইলেন না, ধীরে ধীরে হিমালয়ে আরোহণ করতে লাগলেন। প্রথমে পতন ও মৃত্যু ঘটল দ্রৌপদীর। ভীমের প্রশ্নে ধর্মপুত্রের উত্তর দ্রৌপদীর অপরাধ অর্জুনের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব। মনে পড়ে, দ্রুপদের রাজসভায় বীর্যশুল্কা দ্রৌপদী দাঁড়িয়ে, হাতে সাদা ফুলের একগাছি মালা। উৎকণ্ঠিত আগ্রহে দেখলেন তরুণ বীর অর্জুন অনায়াসে লক্ষ্যভেদ করছেন, ওষ্ঠাধরে আনন্দিত হাসি ও হাতে পুষ্পমাল্য নিয়ে শুচিস্মিতা দ্রৌপদী এগিয়ে এসে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে অর্জুনকে মালা পরিয়ে দিলেন। কুমারী হৃদয়ের সে মুহূর্তের আত্মনিবেদনের চরিতার্থতা, সে কি ভুলবার। দৈবদুর্বিপাকে আরও চার ভাইকে পরে বরণ করতে হয়েছিল, কিন্তু জীবনের প্রথম প্রেম যার প্রতি উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল সে তো

৩. মহাপ্রস্থানিকপর্ব; (১:১২, ১৩)

৪. মহাপ্রস্থানিকপর্ব; (১:৪০)

অর্জুনই। তাঁর দুর্ভাগ্য অর্জুন পর পর অন্য তরুণীদের পাণিগ্রহণ করেন, দ্রৌপদীর সেই শুচিশুভ্র প্রেম তার প্রাপ্য মর্যাদা পায়নি। অর্জুনের ওপর নিষ্ফল অভিমান করেছেন, কর্তব্যে ত্রুটি ছিল না অন্য স্বামীদের প্রতি, কিন্তু প্রথম প্রেম কি শাসন মানে? অর্জুনের প্রতি নিষ্প্রতিদান অনুরাগ তো দ্রৌপদীর জীবনে মর্মন্তুদ যন্ত্রণার মধ্যে গোপনে রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছে— এ.কি পাপ হতে পারে? অথচ ধর্মপুত্র বললেন, এই তার পাপ। এই পাপে তাঁর মৃত্যু। লক্ষণীয়, প্রথম পতন ও মৃত্যু একমাত্র নারী অভিযাত্রিকটিরই, সে কি নারী বলেই?

যুদ্ধের মধ্যে প্রবল ক্ষোভে ও আক্রোশের মুহূর্তে অর্জুন হঠকারীর মতো দাম্ভিক প্রতিজ্ঞা করে বসেন— একদিনে সব শত্রু নিপাত করবেন। এ উচ্চারণে অর্জুনের তখনকার ক্রুদ্ধ আস্ফালনই ছিল। বক্তা শ্রোতা সকলেই জানত এটা সম্ভাব্যতার সীমার বাইরে। এমন তো কত কথাই মানুষ তীব্র আবেগের মুখে বলে; অথচ সেই পাপে নাকি অর্জুনের মৃত্যু। নকুল-সহদেবের বিজ্ঞতা ও রূপের অভিমান কখনও উদগ্ররূপে প্রকাশ পায়নি, কারও ক্ষতিও করেনি। তবু সেই মনোভাব এমন অমার্জনীয় যে সেই পাপে তাঁদের মৃত্যু ঘটল। ভীম অসামান্য বলশালী, দীর্ঘদেহী, আহারে তাঁর প্রয়োজনও বেশি ছিল, রুচিও বেশি ছিল। স্বয়ং কুন্তি জানতেন শক্তিমান পুত্রের প্রয়োজন বেশি, তাই ভোজ্যের অর্ধাংশ ভীমের জন্যে রাখতেন, বাকিটা বাকি চার ভাইয়ের। প্রয়োজনে দৈহিক বলের জন্য সব পাণ্ডবদেরই ভীমের শরণার্থী হতে হয়েছিল। সেই মানুষটা ভোজনপ্রিয় ছিল বলে তাঁর মৃত্যু ঘটল! অর্থাৎ তাঁর সংযম যথেষ্ট ছিল না, তিনি নিষ্কাম ভাবে আহার করতেন না। শুনলে সকলেরই মনে হয়, পাপ ও দণ্ডের মধ্যে কোনও সামঞ্জস্যই এখানে নেই। শেষ পর্যন্ত একা চলেন যুধিষ্ঠির, পিছনে কুকুরটি। এটি স্বেচ্ছায় তাঁদের অনুগামী হয়েছিল বলে একে ত্যাগ করে স্বর্গে যেতে রাজি হননি যুধিষ্ঠির। এতে তাঁর মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে, যদিও কুকুরটি সত্য অর্থে আশ্রিত ছিল না, শুধু অনুগামীই ছিল। তাই তাকে ত্যাগ করার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'মৃতের সঙ্গে (অর্থাৎ মৃত ভাইদের ও দ্রৌপদীর) জীবিতের কি সম্পর্ক? কুকুরটি জীবিত শরণার্থী, একে ত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।[৫] তা না হয় না ত্যাগ করুন, কিন্তু সারা জীবনের সহচর ও সঙ্গিনীর সঙ্গে ক'প্রহরের ব্যবধানে সব সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল? এই মহানুভব উচ্চারণে যুধিষ্ঠিরের শরণাগতরক্ষণের নিদর্শন থাকতে পারে, কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘদিনের সঙ্গীদের বিস্মৃত হওয়ার অকৃতজ্ঞতাও রয়েছে।

এর পরে প্রশ্ন ওঠে যুধিষ্ঠিরের সশরীরে স্বর্গে পৌঁছনোর ব্যাপারে। সামান্য ভোজনবিলাসিতা, প্রজ্ঞাভিমান বা রূপাভিমান, ক্রুদ্ধ মুহূর্তের অবিমৃষ্যকারী প্রতিজ্ঞা, অতি স্বাভাবিক প্রেমজ পক্ষপাতিত্ব, এইগুলি যদি মৃত্যুর কারণ হতে পারে, তা হলে স্বয়ং ধর্মপুত্রের যে স্পষ্ট মিথ্যাভাষণে শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ আচার্যের প্রাণহানি ঘটেছিল সেই মিথ্যাভাষী কোন সুবাদে

৫. মহাপ্রস্থানিক (৩:৩৫, ৩৬)

সশরীরে স্বর্গে পৌঁছন? বলা প্রয়োজন, এই ব্যবস্থাপনা— দ্রৌপদী ও তাঁর চার স্বামীর মৃত্যু ও যুধিষ্ঠিরের সশরীরে স্বর্গগমন— এ সবই দেবতাদের, যাঁদের মধ্যে ধর্মও আছেন। রূপকে পাওয়া যাচ্ছে, যে কুকুরটি যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করেছিল, বাৎসল্যের জন্যে যাকে ত্যাগ করে তিনি স্বর্গে যেতেও রাজি হননি, সে সত্যিই কুকুর নয়, স্বয়ং ধর্ম, যুধিষ্ঠিরের পিতা। এটা তাঁর ধর্মপরায়ণতা বলে গণ্য হল এবং যুধিষ্ঠিরকে ধর্মের অনুগামী না দেখিয়ে মহাকাব্যকার দেখালেন ধর্ম স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের অনুগামী। পরে আমরা দেখব, যুধিষ্ঠির নিষ্পাপ নন, কিন্তু কোনও এক স্তরে তিনি ধর্মের উন্নত শিখর স্পর্শ করেছিলেন যার দ্বারা ধর্ম তাঁর অনুগমন করছে— এই রূপকটি যথাযথ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ ধর্ম যুধিষ্ঠিরের চিরানুগামী, কারণ যুধিষ্ঠির নিজেই সতত ধর্মচারী।

এ তথ্য প্রকাশ পাওয়ার পরে ব্যাপারটা একটা নতুন আলো দেখা দেয়: ধর্ম ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য একটা সম্পর্ক। তা হলে, সেই প্রাণঘাতী মিথ্যাটা কি পাপ নয়? অর্জুনের উত্তেজিত দম্ভোক্তি, যা শুনলেই বোঝা যায় যে এটাকে কার্যে পরিণত করা অর্জুনের বা অন্য কোনও বীরেরই সাধ্য ছিল না, যা ছিল শুধু অসহিষ্ণু রোষের প্রকাশ, সেটাকেই তাঁর প্রাণনাশী মিথ্যা বলে প্রতিপাদন করছেন যিনি, তিনি স্বয়ং মারাত্মক মিথ্যা-উচ্চারণে আচার্য হন্তারক। এখানে বিচারে ন্যায় কোথায়? সমতা বা ভারসাম্য কোথায়? নেই। ওই মারাত্মক মিথ্যাভাষণ সম্পর্কে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করতেও পারতেন। যুদ্ধে পাণ্ডবদের ক্ষমতার সীমাও এতে নিশ্চিত হয়ে গেল: সম্মুখসমরে দ্রোণকে পরাজিত বা নিহত করতে পারতেন না পাণ্ডববীররা— এ কথাও স্বীকৃত হয়ে রইল। অবশ্য কৃষ্ণের পরামর্শে অন্য কৌরব বীরদেরও মৃত্যু ঘটেছে অ-ক্ষত্রিয়োচিত আচরণের দ্বারা। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মিথ্যা বলা তো সজ্ঞানে করা পাপ। তা ছাড়া, শাস্ত্রে বলে 'মৃগয়াক্ষঃ পরীবাদঃ', ইত্যাদি আটটি অন্যায় আসক্তি হল ব্যসন, এবং পরিত্যাজ্য। দ্যূতক্রীড়া (অক্ষ)-ও তার মধ্যে পড়ে। অধিকন্তু, পাঁচ ভাইয়ের স্ত্রীকে একা পণ রাখতে কে তাঁকে অধিকার দিয়েছিল? কিংবা ভাইদের পণ রাখতে? অথবা সকলের যৌথ সম্পত্তি? এই সবই অন্যায়। যখন মনে পড়ে যে, কলি-আক্রান্ত নলও দময়ন্তীকে বাজি রাখতে রাজি হননি, সেখানে দেখি সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে যুধিষ্ঠির পর পর এ সব অন্যায় করলেন। এখানে পাঠক কী ভাববেন? ধর্ম আর যুধিষ্ঠির অভিন্ন হলে এই কি ধর্ম? যুদ্ধান্তে গান্ধারীর কাছে যিনি যুদ্ধের দায়িত্ব নিজের ওপরে নিয়েছিলেন তিনি কি তখন শুধুই ভদ্রতা করে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন? যে পাপ-বোধে সিংহাসনের জন্যে যুদ্ধ করেও করতলগত সিংহাসন গ্রহণ করতে পারছিলেন না সে-আত্মগ্লানি কি অভিনয় মাত্র? তা তো নয়, তিনি তো অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে রাজি হলেন সত্যকার একটা অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পেতেই। কাজেই যুধিষ্ঠির একাধিক অন্যায় করেছিলেন এবং সে নিয়ে তাঁর কোনও মোহ ছিল না। তা হলে এই সশরীরে স্বর্গে পৌঁছনোর ব্যাপারটা কী? দেবতাদের ভুল? পাঠক এইখানে এসে যুধিষ্ঠিরের নিষ্পাপ ধর্মাত্মতা সম্বন্ধে সন্দিহান হন। অথচ কার্যক্ষেত্রে তাঁকে নিষ্পাপ ধর্মাত্মা বলেই প্রতিপন্ন করছে মহাকাব্য।

এ জায়গায় পৌঁছে পাঠকের প্রতিক্রিয়াতে ধাক্কা লাগে এবং ধীরে ধীরে যে সমাধানটি পাঠকের প্রত্যয়ে উদিত হয় তা হল, যুধিষ্ঠিরের বিচার এবং বস্তুত কোনও মানুষের বিচারই একমাত্রিক হতে পারে না। যুধিষ্ঠিরের একাধিক বিচ্যুতি ছিল, কিন্তু কোনও একটি পরিমাপে পড়ে যুদ্ধের প্রাক্কালে যুধিষ্ঠিরের মর্মন্তুদ অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা। সে দিন জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের ক্ষত্রিয়ধর্মচ্যুত হতে দ্বিধা ছিল না। ভিক্ষুকের মতো আচার্যদের পায়ে ধরে যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি প্রার্থনা করতে তাঁর বাধেনি। অর্জুনের দ্বিধাও অর্জুনের চরিত্রে নতুন এক আত্মিক মাত্রা যোগ করেছে। কিন্তু অর্জুনের দ্বিধা স্বজনহত্যার আশঙ্কায়। সে তাঁর পারিবারিক সত্তার আত্মীয় আনুগত্যের ক্ষেত্রে দ্বিধা; তিনি নিজে যুদ্ধ করতে অসম্মত। কিন্তু যুধিষ্ঠির পুরো যুদ্ধ ব্যাপারটাতেই অসম্মত। মনে পড়ে, সিংহাসনে ন্যায়সংগত অধিকার থাকা সত্ত্বেও পাঁচটি গ্রামের বিনিময়ে একদা সিংহাসনের দাবি প্রত্যাহার করতেও তিনি সম্মত ছিলেন। এর মধ্যে রাজকীয় গৌরব তো নেই-ই, সামাজিক এবং ধর্মগত মানদণ্ডে একটা দৈন্য ও অসম্মানও যেন নিহিত ছিল। এইখানে যুধিষ্ঠির এমন এক বড় মাপের মানুষ হয়ে ওঠেন যিনি ক্রান্তদর্শী। আপাত লাভ, যশ, খ্যাতি, বিজয়-সমারোহ ও রাজত্বের লোভকে ছাপিয়ে যিনি দেখতে পেয়েছেন নরহত্যা পাপ,— তা সে যে কারণেই হোক না কেন। কোনও কারণেই কোনও মানুষকে বধ করায় তাঁর অন্তর্নিহিত ধর্মবোধ সায় দেয় না; তাতে আপাত ভাবে ক্ষত্রিয়ধর্ম বা বীরধর্মের নীতি থেকে ভ্রষ্ট হতেও তাঁর বাধে না। এই মনোভাবের সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি আছে যুদ্ধশেষে তাঁর আন্তরিক আত্মগ্লানি ও সিংহাসনে অনীহার। এক যুধিষ্ঠিরই সে দিনের সমাজের প্রত্যাশিত বর্ণধর্মের ওপারে মানবধর্মের শেষ বিচারে সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এবং শেষ পর্যন্ত এইখানেই, এই বিচারদৃষ্টির মহিমাতেই, তিনি ধর্মপুত্র, যিনি সশরীরে স্বর্গে প্রবেশ করার অধিকারী। মহাভারত নানা ভাবে জীবনের তুঙ্গতম শিখরে এই মানবত্বের জয়গান করেছে। করেছে বহু জটিল ঘটনা সংস্থাপনার দ্বারা, ফলে এই মহাকাব্যে সাড়া দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

রামায়ণে পত্নী-অপহারক রাক্ষসকে বধ করার প্রয়াসে দ্বিধার অবকাশ সেই, পারিবারিক মূল্যবোধ ও ক্ষাত্রধর্মের কর্তব্য পালনে দ্বিধার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু যেখানে একটা কর্তব্য— বর্ণধর্মের আদর্শ— পালন করতে গেলে অন্য একটা বৃহত্তর কর্তব্য— মানবধর্মের নির্দেশ— পালন করা যায় না, সত্তার মহত্তর সংজ্ঞার নিরিখে একটা ধর্মপালনে পাপের সম্ভাবনা থাকে, সেখানে সমস্ত ব্যাপারটা চিন্তা, সংবেদনা এবং এক চূড়ান্ত অর্থে আধ্যাত্মিক শুদ্ধতার জবাবদিহির সংকট উপস্থাপিত করে। মনে পড়ে, শান্তিপর্বে ভীষ্মের উক্তি, মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছুই নেই। যুদ্ধে এই মানুষকেই রাখতে হয়, যার ওপরে কেউ নেই। কাজেই মানবজিঘাংসা যার কাছে সব থেকে বড় পাপ তার ধর্ম-বোধ ক্ষত্রিয়তার ওপারে শ্রেষ্ঠ নীতির নিরিখই শুধু মানে। মহাকাব্যকারের দৃষ্টি যে শিখরে উত্তীর্ণ, পাঠককে অস্পষ্ট ভাবে হলেও সে উচ্চতা দূর থেকে প্রত্যক্ষ করে বুঝতে হয় এ মহাকাব্যের গভীরে কোন মহত্তর ন্যায়নীতিবোধ ক্রিয়াশীল। অতএব সাড়া দিতে গিয়েও পাঠক সংকটে পড়েন এবং নিজের বোধের অন্তঃস্থলে সে সংকট অতিক্রম করে তবে মহাকাব্যের মর্মবস্তুটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

স্বর্গারোহণ পর্বে দেখি যুধিষ্ঠির স্বর্গগঙ্গায় অবগাহন করে মর্ত্যদেহটি সেখানেই রেখে দিব্যদেহ নিয়ে উঠেছেন।[৬] তা হলে তাঁর বৈশিষ্ট্য শুধু মর্ত্যদেহ নিয়ে স্বর্গে পৌঁছনোতে? এই আপাতবিরোধী দুটি ঘটনার মধ্যে কবি সম্ভবত বলতে চাইছেন যুধিষ্ঠিরকেও পাপ স্পর্শ করেছিল তাই স্ব-শরীরে তিনি স্বর্গে পৌঁছতে পারলেন, বাস করতে পারেন না। কিন্তু আর সকলের চেয়ে তিনি যে মাথায় বড়, সে কথাটি এর মধ্যে বিধৃত রইল। পৃথিবীর সমস্ত মহাকাব্যের অন্ত্য দৃশ্যেই নায়ক একাকী, তাই মহাপ্রস্থানপর্বের শেষ থেকে মঞ্চে যুধিষ্ঠির একাই, পাঠকের দৃষ্টি পুরোপুরি তাঁর ওপরেই নিবদ্ধ।

স্বর্গে দেবদূত দ্রৌপদীকে দেখিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'ইনি আসলে পদ্মা, স্বয়ং লক্ষ্মী আপনাদের পাঁচ ভাইয়ের বধূরূপে মর্তে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।'[৭] এখানে বেশ কিছু ব্যাপার গোলমেলে ঠেকে। দ্রৌপদীর স্বামীরা ভিন্নভিন্ন দেবতার অংশে জন্মেছেন, কিন্তু তাঁরা সবাই মানুষ এবং কেউই বিষ্ণুর অংশে জন্মাননি। তা হলে দাঁড়াল এই, যে লক্ষ্মীকে ভোগ করলেন পাঁচটি মানুষ, তাঁরা কেউই বিষ্ণু বা বিষ্ণুর অংশও নন। দ্রৌপদী দ্রুপদরাজার যজ্ঞবেদী থেকে উঠেছিলেন আর লক্ষ্মীর উৎপত্তি সমুদ্র থেকে। আসলে মহাকাব্যের নায়কনায়িকাদের দেবতার অংশে জন্মানোর কথা মাঝে মাঝেই বলা হয়ে থাকে, কিন্তু এখানে সম্পর্কে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা, তা ঘটল ওই দ্রৌপদীর ওপরে লক্ষ্মীত্ব পরে আরোপিত হওয়ার জন্যে। ফলে পাঠকের মধ্যে খটকা থেকে যায়, বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মী এই ভিন্ন ভিন্ন দেবতার অংশে জন্মানো পাঁচ ভাইয়ের বধূ হন কি করে? কেউ এ প্রশ্ন করেননি, কোনও উত্তরও দেওয়া হয়নি। শূন্যে প্রলম্বিত হয়ে থাকে সংশয়। মহাকাব্যের মানবিক মূল্যবোধ এতে খণ্ডিত হয় না, সামাজিক সতীত্বের প্রশ্নই শুধু অনুত্তরিত থেকে যায়। এর দ্বারা মহাকাব্যে অন্য এক মহিমা লগ্ন হয়।

স্বর্গে পৌঁছবার পর যুধিষ্ঠিরকে জানানো হল, যেহেতু তিনি ছলনার দ্বারা দ্রোণের মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন, সে জন্যে তাঁকেও ছলনার দ্বারা অল্পক্ষণের জন্য নরকদর্শন করানো হল।[৮] আগেই বলেছি, দ্রোণের মৃত্যু ঘটানো ছাড়াও যুধিষ্ঠিরের অন্য পাপ ছিল, কিন্তু শুধু এইটিরই উল্লেখ করা হল, এই পাপেই নাকি তাঁকে স্বল্পকাল নরকে থাকতে হয়েছিল। নরকদর্শনের মধ্যে তাঁর নৈতিক স্খলনের স্বীকৃতি আছে নাকি এটা মিথ্যাবচনের দ্বারা দ্রোণবধের প্রায়শ্চিত্ত? এখানে কার্যকারণের অসামঞ্জস্য পাঠককে উদ্বেলিত করে: যুধিষ্ঠির ভাইদের দেখতে চেয়েছিলেন বলে তাঁকে নরকে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি পৌঁছনোমাত্রই নরকবাসীদের সব যন্ত্রণার অবসান ঘটল, নারকীয় পরিবেশ লুপ্ত হয়ে মনোরম, উপভোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি হল। তা হলে যুধিষ্ঠির

৬. স্বর্গারোহণপর্ব; ৫:৫ অধ্যায়
৭. মহাপ্রস্থানিকপর্ব; (৩:১৪)
৮. স্বর্গারোহণপর্ব; (৩:৩৯, ৪০)

এক মুহূর্তের জন্যেও কিন্তু নরকভোগ করলেন না, যদিও মিথ্যাভাষণের দ্বারা আচার্যের মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন, 'ব্যসন' বলে বর্ণিত জুয়া খেলেছিলেন— নিজের অপটুতা ও পরাজয়ের সম্ভাবনা জেনেও। এবং বাজি রেখে খেলে হারলেন যে সম্পত্তি তা তাঁর একার নয়, ভাইদের বাজি রাখার অধিকার যুধিষ্ঠিরের ছিল না। কারণ তাঁরাও দ্রৌপদীর স্বামী, দ্রৌপদীকে বাজি রেখে হারবার অধিকার ছিল না, কারণ দ্রৌপদী অন্য ভাইদেরও স্ত্রী— এত সব পাপের জন্য কী প্রায়শ্চিত্ত? নরকদর্শন, যে নরক তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই নরকত্ব থেকে মুক্ত হল। মুহূর্তকাল, দূর থেকে শুধু নরক দেখাতেই এত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হল? এ কেমন নৈতিক বিচার? পাঠক বিমূঢ় বোধ করেন। একটিমাত্র সমাধানে ঠেকে সব জিজ্ঞাসা: যুধিষ্ঠির মানবিক নীতির মানদণ্ডে বড় মাপের মানুষ ছিলেন। যুদ্ধ এবং যুদ্ধের অনিবার্য মনোভাব যে জিঘাংসা এবং তার অনিবার্য পরিণতি যে লোকক্ষয়, বিশেষত যারা মরবে তাদের মধ্যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সৈন্যই সিংহাসনকামী নয়— এই সব নিয়ে নিরন্তর মর্মপীড়ায় দগ্ধ হয়েছেন যুধিষ্ঠির। সেই যন্ত্রাণাতেই জীবৎকালেই তাঁর বহু পাপ স্খলন হয়েছিল। তাই যন্ত্রণার নরকেই তিনি আন্তর শুচিতায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং সেই কারণেই নরক তাঁর স্থান নয়।

স্বর্গ-নরক পাপ-পুণ্য নিয়ে এই অতি দুরূহ জটিল বোধ রামায়ণে কুত্রাপি নেই। সেখানে কর্তব্য অকর্তব্য অধিকাংশ স্থলেই সরলরৈখিক। যেখানে নয়, যেমন বালীকে ও শম্বুককে বধ করা এবং বারবার সীতা পরিত্যাগ, সেখানে রামচন্দ্রের যন্ত্রণা নেই— একেবারে শেষে বিচ্ছেদবোধ ছাড়া, এবং সেটাও দাম্পত্য আবেগপ্রসূত, কোনও গভীর নীতির সংকট তাঁর নেই। লঙ্কায় সীতা পরিত্যাগের সময়ে রামচন্দ্র যে সব মর্মান্তিক কটুকথা সীতাকে বলেন তার ভূমিকায় ওই অধ্যায়ের শুরুতেই বলা আছে 'হৃদয়ান্তর্গতং ভাবং প্রবক্তুমুপচক্রমে' অর্থাৎ ওই কটুকথা রামের মনোগত ভাব; দেবতারা সীতার সতীত্ব প্রতিপাদন করবেন জেনে লোকনিন্দার ভয়ে সীতাকে পরীক্ষা করবার ছলে ওই সব বলেননি। সীতা চিতায় দেহত্যাগ করবেন এইটে জেনেও বাধা দেননি— সীতা যে রাবণের অঙ্কশায়িনী হননি এ কথা বিশ্বাসই করতে পারেননি বলে। মনে পড়ে, উত্তরকাণ্ডে রাম অযোধ্যার সিংহাসন ভরতকে দেন, লব-কুশকে নয়; তখনও তা হলে সীতার সতীত্বে পুরো বিশ্বাস আসেনি? আর যুদ্ধ ক্ষেত্র লঙ্কায় তো অযোধ্যার প্রজা কেউ ছিল না, কাজেই প্রজার জ্ঞানের জন্য ওই সব বলেছিলেন এ কথা একেবারেই প্রণিধানযোগ্য নয়। অতএব রামের কাছে নৈতিক সংকট যতবার এসেছে— একমাত্র পিতৃসত্য রক্ষা ছাড়া এবং ভরতের অনুরোধে তা থেকে বিচ্যুত না হওয়া ছাড়া— সর্বত্রই রাম নৈতিক সংকটে অন্যায়কে অবলম্বন করেছেন। এবং কোথাও পাঠকের চিত্ত নৈতিক দ্বিধায় দোলাচল হয় না। রামায়ণের নৈতিক জগৎ সাদাকালোয় বিভাজিত— ধূসর বা দো-রঙা কিছু নেই।

স্বর্গারোহণের শেষ দিকে সব কৌরববীর সেনাপতি ও আচার্যরা স্বর্গে এসে গেছেন। কোনও কারণ দেখানো হয়নি; অল্পকাল স্বর্গবাস ও দীর্ঘকাল নরকবাস তাঁদের প্রাপ্য বলে শোনা গিয়েছিল আগে, কিন্তু কার্যত দীর্ঘকাল নরকবাস তাঁদের করতে হয় না। কেন, তা

বলা হয়নি। মনে হয়, বীর হিসেবে তাঁদের অম্লান কল্পমূর্তি পাণ্ডবদেরও ওপরে; কারণ কৌরব সেনাপতিরা পাণ্ডবদের কুচক্রে অন্যায় যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। এইখানে কৌরবদের একটা নৈতিক জিৎ রয়ে গেল, যা পাণ্ডবরা অর্জন করতে পারেননি। কৃষ্ণের পরামর্শে উদ্যোগপর্বে উভয়পক্ষে স্বীকৃত শর্তগুলি পাণ্ডবরা নির্বিচারে পদদলিত করেছেন। কৌরবরা যুদ্ধকালে সে রকম অন্যায় করেননি। অভিমন্যুবধের উল্টোদিকে ঘটোৎকচ বধ আছে। কোনও একটা জায়গায় কৌরবরা বীরধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হননি বলে বীরের স্বর্গ থেকে তাঁদের বিচ্যুত হতে হয়নি। হিসেবটি খুবই সূক্ষ্ম, বহুমুখীন এবং বহুধাব্যাপ্ত। ভাবতে হয়, মননে, সংবেদনে স্থির হয়ে গ্রহণ করতে হয়; না হলে আপাত বৈষম্য দুর্লঙ্ঘ্য থেকে যায়। এত আয়াস কোনও রামায়ণ-পাঠককে করতে হয় না।

শেষ অংশে দু'বার বলা হয়েছে: 'রাজাদের নরক দর্শন করতেই হয়';[৯] কোনও কারণ দেখানো হয়নি। প্রশ্নটার বোধহয় দুটো সমাধান আছে। প্রথমত, রাজা বিজিগীষু বা বিজয়কামী হলে যুদ্ধ করতেই হবে, এবং রাজ্য-বিস্তারের জন্যে যে যুদ্ধ, তাতে নিরপরাধের বিরুদ্ধেই যুদ্ধযাত্রা এবং নিরপরাধের প্রাণহানি অনিবার্য; সে পাপ রাজাকে স্পর্শ করেই। আর রাজা যদি বিজিগীষু নাও হন, তবু শাসন করতে গেলেই দণ্ড বিধান করতেই হয় এবং তার মধ্যে নিরাপরাধের দণ্ডিত হওয়ার একটি সম্ভাবনা থাকে। যদি অপরাধীরই দণ্ডবিধান হয়, তবু তার মধ্যে কিছু নিষ্ঠুরতা থাকেই, সে পাপও রাজাকে স্পর্শ করে। এ ছাড়া চরবৃত্তির ছলনা, প্রয়োজনে নিরপরাধকে প্রতারণা করে ইষ্টসিদ্ধি করা এ সবের পাপও আছে। এ সব বোঝা গেলেও প্রশ্ন থাকে যে, এ ধরনের আচরণ তো অর্থনীতি ও রাজনীতি-সম্মত, এতে পাপ কোথায় যে রাজাকে নীতিসঙ্গত আচরণ করেও নরকদর্শন করতে হবে? আবার তাই মহাভারতের ভিত্তিভূমি যে নীতিসংকট, ধর্মসংকট সেইখানেই পৌঁছে যেতে হল। এ সংকট রাজধর্মের সঙ্গে মানবধর্মের। ব্যবহারিক জগতে এর কোনও সমাধান নেই; তাই একটা কল্পিত চূড়ান্ত রায় দেওয়া হল: একটা ধর্মের নীতির সঙ্গে অন্য ধর্ম বা নীতির সংঘাতে শেষ পর্যন্ত মহত্তর নীতির পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার। তাই অপেক্ষিত ক্ষত্রিয়ধর্মে রাজধর্ম পালন করেও মানুষ শেষ মানবিক বিচারে দণ্ডিত হতে পারে। এ সবের উপস্থাপনা ওই মানবধর্মের চূড়ান্ত জয় ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে। মহাভারতে এ উদ্দেশ্য যতটা ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত, তার জয়ের স্থাপনাও ততটাই ঊর্ধ্বে। এবং এ-তত্ত্বকে প্রণিধান করতে গেলে বহু অভ্যস্ত নীতির স্তর পেরিয়ে যেতে হয়। এই কারণেই পাঠকের কাছে মহাভারতের দাবি এত বেশি জটিল, এত মর্মযন্ত্রণায় তার উপলব্ধি; শুধু মাত্র বোধে নয়, বোধিতে। সহজেই অনুমান করা যায়, এই আয়াস-সাধ্য জীবনবোধের অন্বেষা সাধারণ পাঠককে বিভ্রান্ত করবে, নিরুৎসুক করবে; ফলে মহাভারতে সাড়া দেওয়া তার পক্ষে দুঃখসাধ্য হয়ে উঠবে কাজেই, জনপ্রিয়তার ভিত্তি

৯. স্বর্গারোহণপর্ব; (৪:৯)

এখানে নেই। অনেক সহজে সাড়া দেওয়া যায় রামায়ণে— পাঠককে তা ব্যাকুল, মর্মপীড়াগ্রস্ত বা বিমূঢ় করে না। তাই বলা হয়েছে 'রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যম্', রামের মতো আচরণ করতে হবে। সেখানে মহাভারত বলছে, মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই, এবং এই সুদীর্ঘ মহাকাব্যটি জুড়ে সেই মানুষের সংজ্ঞানিরূপণ করা হয়েছে, নৈতিক মূল্যবোধের সংঘাতের মধ্যে দিয়ে।

মহাভারতে আপাত-নিষ্ক্রিয় এক সন্ন্যাসীর মতো চরিত্র হলেন ভীষ্ম। মনুষ্যজন্মের পূর্বে ইনি স্বর্গের অষ্ট বসুর অন্যতম দ্যু-নামের বসু ছিলেন। ভাইদের একদিন ইনি বশিষ্ঠের কামধেনু চুরি করার প্ররোচনা দেন। বশিষ্ঠ প্রথমে সকলকেই শাপ দেন মানুষ হয়ে পৃথিবীতে জন্মাবার; পরে সেটা প্রত্যাহার করে শুধু দ্যু-কেই শাপ দেন। এই শাপে বসুরা গঙ্গা ও শান্তনুর পুত্ররূপে জন্মান। গঙ্গা জন্মমাত্রেই প্রথম সাতটি পুত্রকে জলে নিক্ষেপ করেন। পূর্ব-শর্ত মতো শান্তনু প্রতিবাদ করেননি; কিন্তু অষ্টম সন্তানের বেলা প্রতিবাদ করতেই গঙ্গা সন্তানটিকে নিয়ে শান্তনুকে ত্যাগ করে যান। গঙ্গা এই পুত্রের নাম দেন দেবব্রত এবং বশিষ্ঠ ও গঙ্গা একে শিক্ষিত করে তোলেন। বত্রিশ বছর পরে একদিন শান্তনু দেখেন এক কুমার বাণবর্ষণে নদীর স্রোতকে রুদ্ধ করছেন; রাজার সন্দেহ হতে গঙ্গাকে স্মরণ করতেই তিনি এসে পুত্রকে প্রত্যর্পণ করেন ও জানান যে পুত্রটির কোনও সন্তান হবে না এবং তিনি যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করবেন।[১] রাজা দেবব্রতকে নিয়ে এসে যৌবরাজ্যে অভিষেক করেন। চার বছর পর দাশরাজ-কন্যা সত্যবতীকে দেখে শান্তনু আসক্ত হলেন কিন্তু দাশরাজ শর্ত করেন যে, সত্যবতীর গর্ভজাত পুত্রকেই রাজ্য দিতে হবে। পিতার বিমর্ষতার কারণ জানতে পেরে, দেবব্রত দাশরাজের কাছে ও শান্তনুর কাছে অঙ্গীকার করেন যে তিনি চিরকুমার থাকবেন, রাজ্য নেবেন না। এর পরিবর্তে তিনি অক্ষয় স্বর্গলাভের বর প্রার্থনা করেন। শান্তনু সন্তুষ্ট হয়ে, তাঁকে ইচ্ছামৃত্যুর বরও দেন।[২] এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্যে তাঁর নাম হয় ভীষ্ম। কিছু দিন পরে তিনি ঋষি পুলস্ত্যের কাছে তীর্থমাহাত্ম্য শুনে তীর্থে যান।

শান্তনুর পুত্র ভীষ্মের অনুজ সত্যবতীর পুত্র চিত্রাঙ্গদ তিন বছর ধরে গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধে রত ছিলেন। সর্বশাস্ত্রজ্ঞ ভীষ্ম তাঁকে তখন কোনও রকমে সাহায্য করেননি; চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুর পরে তিনি তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেন।[৩] স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, ভীষ্ম অনুজের বিপদে

১. স্বর্গারোহণপর্ব; (৩:১৪)
২. স্বর্গারোহণপর্ব; (৩:১১, ৩৫)
৩. আদিপর্ব; (১১.২১, ৯৩:৩৮, ৯৪:৬২)

উদাসীন রইলেন কেন? এর একটা উত্তর হল ঔদাসীন্য ভীষ্ম চরিত্রের একটি প্রধান লক্ষণ। যিনি পিতার দাম্পত্যসুখের ব্যবস্থা করতে নিজের দাম্পত্য সম্ভাবনা রহিত করে দিলেন তাঁর চরিত্রে শৌর্য ছিল না— এ কথা বলা চলে না। অথচ গন্ধর্বদের হাতে ভ্রাতার মৃত্যু ঘটলেও তিনি ক্ষত্রিয় নীতি অনুসারে তার কোনও প্রতিশোধ নেননি; এটি কতকটা স্ববিরোধী আচরণ। বিচিত্রবীর্য রাজা হলে সত্যবতীর সাহায্যে ভীষ্মই প্রকৃতপক্ষে রাজ্য চালনা করতেন যদিও নিজে রাজ্য প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অর্থাৎ রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, কিন্তু সুখবিলাসটা ভোগ করেননি। মনে পড়ে রামচন্দ্রের কথা— পিতার প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য বনে আসবার পর তাঁকে আর একবার প্রলোভিত করা হয়, যখন ভরত এসে তাঁকে রাজ্য নিবেদন করেন; রামচন্দ্র সংকল্পে অবিচল ছিলেন। কিন্তু ভীষ্মকে বারে বারে প্রলোভনের সম্মুখীন হতে হয়। রামচন্দ্রের মতো তাঁরও জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে সিংহাসনে অধিকার ছিল, কিন্তু পিতার দাম্পত্য সুখের জন্য তা অনায়াসে ত্যাগ করলেন। কিন্তু ভীষ্মের ত্যাগ শুধু সিংহাসন নয়, দাম্পত্য জীবন, সন্তান সব কিছুই। দু-পুরুষের সুখ সম্ভাবনা তিনি ত্যাগ করলেন পিতার সুখের জন্যে। সে তুলনায় রামচন্দ্র বনবাসে সীতার সাহচর্য ও লক্ষ্মণের সেবা সবই পেয়েছিলেন, এবং চতুর্দশ বৎসরের পরে সিংহাসনও ফিরে পেয়েছিলেন।

অম্বা যখন ভীষ্মকে বললেন যে তিনি মনে মনে শাল্বরাজকে পতিত্বে বরণ করেছেন তখন ভীষ্ম তৎক্ষণাৎ অম্বাকে শাল্বরাজের কাছে পৌঁছে দিলেন।[৪] এ আচরণের মধ্যে রাজপুত্রসুলভ সৌজন্য ও ক্ষত্রিয়-সুলভ ন্যায়বোধ প্রকাশ পেয়েছে। শাল্বরাজ অম্বাকে প্রত্যাখ্যান করলে পরশুরাম বলেন ভীষ্মের উচিত অম্বাকে বিবাহ করা। আবার সেই প্রলোভন; কৌমার্যব্রত থেকে স্খলিত হওয়ার নির্দেশ, কিন্তু অবিচলিত ভীষ্ম তেইশ দিন পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে পরাজিত করেন। এখানেও ওই নির্লিপ্ত ঋষিকল্প মানুষটির ক্ষত্রিয়সুলভ আচরণ।

বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর সত্যবতী এবং প্রজারা ভীষ্মকে অম্বিকা ও অম্বালিকাকে বিবাহ করে আপদ্ধর্মনীতি অনুসারে সংসার-ধর্ম পালন করতে বলেন; আবার সেই প্রলোভন এবং আবার নির্দ্বিধায় প্রলোভন জয়। এখানে স্মরণ করতে হবে, শাস্ত্র এবং দেশাচারের নির্দেশ ছিল অপুত্রক জ্যেষ্ঠের মৃত্যু হলে কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূদের বিবাহ করে সন্তান উৎপাদন করবেন। কিন্তু ভীষ্মের কাছে শাস্ত্রনির্দেশের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল নিজের অঙ্গীকারের কাছে খাঁটি থাকা।

অবশেষে বেদব্যাসের ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু জন্মালেন এবং তাঁদের দু'জনের একশো পাঁচ পুত্রের অস্ত্রশিক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব ভীষ্ম একাই বহন করেন।[৫] পরে যথাক্রমে দ্রোণ ও কৃপাচার্যকে নিযুক্ত করেন রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষার জন্য; অর্থাৎ পিতামহের কর্তব্য তিনি

৪. আদিপর্ব; (৯৪:৯৪); হরিবংশ (১৬:২৯)

৫. আদিপর্ব; (৯৬:৪৮-৫১)

অনেকটাই করেছিলেন এবং এই রাজকুমারদের সুবাদেই মহাকাব্যে তাঁর পরিচিতি 'পিতামহ ভীষ্ম' হিসেবে। এর পর তিনি পিতামহের ভূমিকায় আসীন। জতুগৃহদাহে পাণ্ডবদের মৃত্যু হয়েছে ভেবে এই ক্ষত্রিয়বীর অশ্রুপাতও করেছিলেন।[৬] সেখানে তিনি নেহাৎই স্নেহাতুর পিতামহ।

ভীষ্মের শৌর্য বোধহয় সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পেয়েছে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে। সেখানে ভীষ্ম কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ অতিথির অর্ঘ্য দেওয়ার প্রস্তাব করলে শিশুপাল ভীষ্মকে যৎপরোনাস্তি অপমান করে; ক্রুদ্ধ ভীষ্ম প্রত্যুত্তর দেওয়ার সময়ে বহু কটুকথার সঙ্গে এও বলেন যে, শিশুপাল ও তাঁর দলের লোকদের মস্তকে তিনি পদাঘাত করবেন।[৭] কৌরবপক্ষীয় হয়েও ভীষ্ম বারে বারেই দুর্যোধনকে পরামর্শ দেন পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে মিত্রতা করতে। ভীষ্মের চরিত্রের দুর্বলতম দুটি অধ্যায় হল, কৌরবসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ও লাঞ্ছনা নিষ্প্রতিবাদে বসে দেখা। এটি ক্ষত্রিয় ধর্মে অপরাধ: দুর্বল, আক্রান্ত, শিশু, বৃদ্ধ ও নারীর রক্ষা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য-কর্তব্য। এর পরে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসকালে যখন চর এসে বলে যে পাণ্ডবরা নিরুদ্দিষ্ট, তখন কৌরবদের কী করণীয় সে বিষয়ে যে পরামর্শসভা বসে সেখানে উপস্থিত থেকেও ভীষ্ম নীরব ছিলেন, কোনও পরামর্শই দেননি। কৃষ্ণ যখন কৌরবরাজ-সভায় পাণ্ডব পক্ষ থেকে সন্ধি প্রস্তাব আনেন তখন দুর্যোধন কৃষ্ণকে বন্দি করতে চাইলে ভীষ্ম বাধা দেন, কেন না দূত অবধ্য।[৮] কিন্তু তাঁর এ কাজটি পাণ্ডবদের অনুকূলেই যায়, যেমন আরও অনেক অন্য কাজও কৌরব-স্বার্থবিরোধী ছিল।

যুদ্ধের ঠিক পূর্বমুহূর্তে যুধিষ্ঠির ছুটে এসে ভীষ্মের পায়ে পড়ে যুদ্ধ বন্ধ করতে মিনতি করলেন। ভীষ্ম উত্তর দিলেন: 'মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কখনও মানুষের দাস নয়। এ কথা সত্য, মহারাজ, অর্থের জন্যেই আমি কৌরবপক্ষে আবদ্ধ। তাই এখন ক্লীবের মতো বলছি যুধিষ্ঠির, এ ছাড়া অন্য কিছু চাও।'[৯] এখানে সবচেয়ে মর্মান্তিক স্বীকারোক্তি হল, 'অর্থের জন্যে আমি কৌরবপক্ষে বাঁধা পড়ে আছি, আমি কৌরবদের অন্নদাস, তাই ন্যায় হোক অন্যায় হোক ওই পক্ষেই আমাকে যুদ্ধ করতে হবে।' নিজেই বলছেন 'ক্লীবের মতো বলছি' অর্থাৎ ভীষ্ম সচেতন যে, ক্ষত্রিয়োচিত নয়, এ সিদ্ধান্ত দাসোচিত। ভীষ্ম কৌরব পাণ্ডব উভয়েরই প্রথম শাস্ত্রগুরু। আচার্য যেখানে শিষ্যদের শিক্ষা দেন, সেখানে তাঁর তো দাবিই থাকে ভরণপোষণে। সে দাবি তাঁর প্রদত্ত শিক্ষার বিনিময়ে, ঘটনাচক্রে এ ভরণপোষণ তাঁকে নিতে হয়েছিল কৌরবদের ভাণ্ডার থেকে; কিন্তু এতে তাঁর ঋণ থাকবে কেন? তিনি যোগ্যতা ও পরিশ্রমের দ্বারা যা অর্জন করেছেন সে সম্বন্ধেও এই দীন উচ্চারণ, এটা পাঠককে দ্বিধায়

৬ আদিপর্ব, (১২০ ২৯, ১২২:৪০)
৭. আদিপর্ব; (১১৭:১৬)
৮. সভাপর্ব; (৪১'৩১)
৯. উদ্যোগপর্ব; (৮৬:১৯-২২)

ফেলে। বিশেষ করে এই কারণে যে, এই কল্পিত ঋণ তিনি শোধ করেছেন সজ্ঞানে অন্যায় সমরে যুদ্ধ করে। তাঁর দ্বিতীয় পাপ দেহে-মনে-অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সভাসদ হয়ে দুর্যোধনের ওই নারকীয় পাপ— প্রকাশ্য রাজসভায় রাজকুলবধূর নির্মম অবমাননা— তা নীরবে সহ্য করা। ধৃতরাষ্ট্রের অন্নগ্রহণ করা ভীষ্মের নিজের বিবেকের কাছে তাঁর আদিম ও অন্তিম অপরাধ, তার জন্য কঠিন মূল্য দিতে হয়েছিল আপন বিবেককেই বধ করে। যুদ্ধে কৌরবপক্ষের প্রথমে সেনাপতি হওয়া এরই অনিবার্য পরিণতি। যুযুৎসু বা বিদুর কৌরবের অন্নপালিত হয়েও বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ করেননি, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। ভীষ্ম সে সৎসাহসের পরিচয় দিতে পারেননি।

ভীষ্মের চরিত্রে এ দ্বিধা একান্তই মৌলিক ও নিরতিশয় জটিল। কৌরবকুল প্রধান ও সৈন্যধক্ষ্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, পাণ্ডবদের তিনি বধ করবেন না; প্রত্যহ দশ হাজার সৈন্য ও এক হাজার রথ বিনষ্ট করবেন কিন্তু পাণ্ডবদের আঘাত করবেন না।[১০] নবম দিনের রাত্রে ইচ্ছামৃত্যু-বরে অবধ্য ভীষ্মকে বধ না করতে পেরে বিপর্যস্ত ও বিপন্ন পাণ্ডবরা ভীষ্মের সঙ্গে দেখা করে তাঁর মৃত্যুর উপায় জানতে চাইলে তিনি অর্জুনকে বলেন, শিখণ্ডীকে রথের সামনে রাখতে। এটিও সেনাপতির অকর্তব্য। পরদিন, যুদ্ধের দশম দিনে তিনি দশ হাজার হাতি, অযুত রথারোহী সৈন্য ও এক লক্ষ পদাতিক সৈন্যকে বধ করেন, কিন্তু প্রধান প্রতিপক্ষ পাণ্ডবদের কোনও ক্ষতি করেননি।[১১] সে-জন্মে শিখণ্ডী পূর্ণ পুরুষ জেনেও পূর্বজন্মে তার নারীত্বের সুবাদে ভীষ্ম অর্জুনের বিরুদ্ধে শরনিক্ষেপ করলেন না। দুর্যোধনের দুর্বাক্যে মর্মাহত হয়ে একবার অর্জুনের দিকে ধাবিত হলে কৃষ্ণ সুদর্শনচক্র দিয়ে অর্জুনকে বাঁচান। সেদিনই সূর্যাস্তের আগে সমস্ত দেহে অর্জুনের শরে জর্জরিত অবস্থায় ভীষ্ম রথ থেকে পড়ে যান। অর্জুন বাণ দিয়ে তাঁর উপাধান নির্মাণ করেন এবং ভীষ্মের তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে শরনিক্ষেপ করে ভূগর্ভ থেকে প্রস্রবণ সৃষ্টি করেন যা ভীষ্মের ওষ্ঠের সামনে জলধারা বর্ষণ করে। ওই শরশয্যায় ভীষ্ম আটান্ন দিন কাটান, তার পরে সূর্য উত্তরায়ণে গেলে নিজের ইচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেন।[১২] মৃত্যুর পূর্বে দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করতে উপদেশ দেন।

লক্ষ্য করলে দেখি, ভীষ্মচরিত্রটি সাংঘাতিক ভাবে দ্বিধাখণ্ডিত। কৌরবের আশ্রয়ে থেকে কৌরবদের পক্ষেই যুদ্ধ করবেন, এটা বোঝা যায়। কিন্তু কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করে পদে পদে কৌরব-স্বার্থের হানি ঘটাবেন এইটেই সেই মৌলিক দ্বিধার প্রকাশ। প্রথমত, দ্রৌপদীর অপমান নিষ্প্রতিবাদে সহ্য করাই বীরধর্ম থেকে বিচ্যুতি; তার পরে বারবার দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করতে বলা তো কৌরবদের বিরুদ্ধাচরণই। যুদ্ধে কোনও মতেই পাণ্ডবদের কোনও

১০. ভীষ্মপর্ব; (৪:৪১, ৪২)
১১. ভীষ্মপর্ব; (১১৪:১২)
১২. ভীষ্মপর্ব; (১০০:৩০-৩২)

ক্ষতি না করা সেনাপতির কর্তব্যে প্রবল ত্রুটি, কৌরবদের প্রতি ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা। অথচ এই মানুষটি শান্তিকামী যুধিষ্ঠিরকে প্রত্যাখ্যান করেন এই বলে যে, তিনি কৌরবদের কাছে ঋণবদ্ধ। এই কি তাঁর ঋণশোধ? যুদ্ধে যিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর, নিজের ইচ্ছা না হলে যাঁকে বধ করা যাবে না তেমন সেনাপতি তাঁর দীর্ঘতম সৈনাপত্যের দশ দিনে অজস্র সৈনিক, রথারূঢ় ও পদাতিককে বিনষ্ট করলেন, কিন্তু মুখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী পাণ্ডব ভ্রাতাদের কোনও ক্ষতিই করলেন না। সেনাপতি হিসেবে এ তো চরম অধর্ম।

প্রতিন্যাসে মনে পড়ে বিভীষণকে, তাঁর বিবেকের দ্বন্দ্ব তিনি কত সহজে, কত বেশি সরলরৈখিক ভাবে নিরসন করেছিলেন। রামের পক্ষে যোগ দেওয়া তাঁর রাক্ষসজন্ম এবং রাজভ্রাতার কর্তব্যের নিরিখে কৃতঘ্নতা; কিন্তু তিনি সরাসরি পক্ষত্যাগ করেছিলেন। রাবণ অন্যায়কারী, পরস্ত্রী-অপহারক, অতএব তার স্বপক্ষে থাকা অন্যায়। তাই তিনি রামের শরণাগত হয়ে অনুমতি চেয়ে নিলেন তাঁর পক্ষেই যুদ্ধ করার। এর পরে আর একবারও পিছনে ফিরে চাইলেন না, দ্বিধাগ্রস্তের মতো কোনও আচরণই করেননি। সে তুলনায়, ভীষ্মের চরিত্রে এবং কাজে সাড়া দেওয়া পাঠকের পক্ষে অনেক বেশি দুরূহ, কারণ ভীষ্ম পদে পদে বিবেক এবং অন্নদাসের কৃত্যের মধ্যে দ্বন্দ্বে জর্জরিত। প্রভূত সংখ্যায় রথী, রথ ও পদাতিককে প্রত্যহ বধ করবেন, কিন্তু সেনাপতির যা মুখ্য করণীয়— প্রতিপক্ষের প্রধান বীরদের ধরাশায়ী করা— যা তাঁর সাধ্যের মধ্যেই ছিল, তা তিনি ভুলেও করতে উদ্যত হলেন না। এর মধ্যে খুব মোটা দাগের একটা বিশ্বাস হনন আছে। পাণ্ডবদের ক্ষতিসাধন করা, ধ্বংসসাধন করাই যে-যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য, সেই যুদ্ধে ভীষ্ম অন্ন-ঋণ শোধ করতে সৈন্যপত্য গ্রহণ করলেন, অথচ সেনাপতির প্রধান কর্তব্যে সম্পূর্ণ বিমুখ রইলেন। ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য, সেনাপতির কর্তব্য, অন্নদাসের কর্তব্য, এ সবই ভীষ্ম জানতেন কিন্তু তার সঙ্গে তাঁর বিবেকের অন্তঃস্থলে বিরোধ জাগাল প্রকৃত মানবধর্মের প্রতি কর্তব্য। সেখানে তিনি অনুক্ষণ অবহিত যে কৌরবরা, যারা দ্রৌপদীর অন্যায় অপমানের দ্বারা গভীর ভাবে কলঙ্কিত, তাদের পরাজয়ই বাঞ্ছনীয়। এই বোধ তাঁকে নিয়ে গেল সেই দুঃসহ নরকযন্ত্রণার মধ্যে যেখানে পরস্পরবিরোধী দুটি কর্তব্যের মধ্যে কোনও আপোস নেই। তাই ভীষ্ম মর্মান্তিক যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে হতে দশম দিনে অস্ত্র ত্যাগ করে অর্জুনের শরধারা সমস্ত অঙ্গ পেতে গ্রহণ করতে লাগলেন: 'যেমন করে উষ্ণার্ত জন গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহের পর প্রথম বারিধারা সর্বাঙ্গে গ্রহণ করে।'[১৩] মৃত্যু আসছে এবার মুক্তির রূপ ধরে।

হয়তো এই অনুক্ষণ নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগই তাঁকে অধিকার দিয়েছিল সুদীর্ঘ শান্তিপর্বের মোক্ষধর্ম, রাজধর্ম, আপদ্ধর্ম ও তীর্থধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার। বোঝা কঠিন নয়, এই বিপুল উপদেশমালা প্রক্ষিপ্ত; তৎকালীন সমাজ ও যুগোপযোগী কিছু কিছু নীতি ও ধর্মের

১৩. অনুশাসনপর্ব; (১৫৩:২৭, ২৮)

কথা মহাভারত স্থায়ী ভাবে ধরে রাখতে চেয়েছিল। তাই কৃত্রিম ভাবে ভীষ্মের শরশয্যানির্মাণ, পানীয় জল ও মস্তকের উপাধান রচনা, কৃষ্ণের বরে আসন্নমৃত্যু বৃদ্ধের বাক-শক্তিলাভ ও আটান্ন দিন ধরে উপদেশবর্ষণ। যুদ্ধের প্রাক্‌ক্ষণে সুদীর্ঘ ভগবদগীতা যেমন প্রক্ষিপ্ত, মৃত্যুর পূর্বাহ্ণে ভীষ্মের এই সুদীর্ঘ উপদেশবাণীও তেমনই প্রক্ষিপ্ত। হয়তো বীজাকারে অল্প কিছু উপদেশ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে দিয়েছিলেন, কিন্তু শান্তিপর্ব তাঁকে যে-রূপে উপস্থাপিত করছে স্পষ্টতই তা কৃত্রিম ও কষ্টকল্পিত। কিন্তু যেটা লক্ষ করার বিষয় তা হল, মহাভারতকার ভীষ্মকে উপদেশ দেওয়ার অধিকারী বলে বিবেচনা করেছেন। এ কথা ভুললে চলে না যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে জীবনের সব পর্বে আচরণীয় নীতি সম্বন্ধে যাঁরা শাস্ত্র রচনা করেছেন তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই সংসারত্যাগী ঋষি। এক অর্থে ধর্ম, অর্থ, কাম, রাজধর্ম, বর্নাশ্রমধর্ম, ইত্যাদি সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার পক্ষে তাঁরা অনধিকারী। কারণ, তাঁরা সংসারের বাইরেই জীবনযাপন করেছেন, ফলে, এ সব বিষয়ে তাঁদের কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। অপরপক্ষে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জড়িত মানুষ নির্লিপ্ত ভাবে এ সব বিষয়কে অনুধাবন করতে পারে না, যেহেতু জড়িত থাকায় তাঁদের দৃষ্টি আবিল— নির্মোহ নয়। তাই দূর থেকে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতে পারেন যে-মানুষ, প্রাচীন ভারতবর্ষ তাঁদেরই শাস্ত্রকার আচার্যের আসনে বসিয়েছে। তাই শান্তিপর্বের অধিকাংশই প্রক্ষিপ্ত হলেও সংসার জীবন, রাজত্ব, মানসিকতা, আতিথ্য, ইত্যাদি নানা বিষয়ে কথা বলার গৌরব ভীষ্মকে দেওয়া হয়েছে এবং এ গৌরবের অন্যতম সত্য এক উৎস হল, তাঁর নিরন্তর যন্ত্রণাভোগ।

চিরকুমার, এক অর্থে অ-সংসারী, এই ঋষিকল্প মানুষটি ক্ষত্রিয়ধর্মের কাছ থেকে পলাতক, সেনাপতির কর্তব্যে বিশ্বাসহন্তা, কৌরবদের অন্ন-ঋণ শোধ করছেন গোপনে তাদের বঞ্চনা করে, এই সব পরস্পরবিরোধী কৃত্য সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হয়নি। চিত্তের গোপনে একটি ক্রূর, দুঃসহ আততি বহন করেছেন দীর্ঘকাল। যে মানুষ পিতাকে সুখী করবার জন্যে অনায়াসে আমরণ জীবনের অপূর্ণতা, অতৃপ্তি বরণ করেছেন, এবং তা বহন করেছেন অনায়াসে বারংবার প্রলুব্ধ হওয়া সত্ত্বেও, সেই মানুষই ক্ষত্রিয়ধর্ম, কৌরবদের প্রতি আনুগত্য, বীরকৃত্য ও সৈনাপত্য কর্তব্য থেকে কি গভীর ভাবে স্খলিত! প্রথম ত্যাগটা ছিল ব্যক্তিজীবনের সুখ বিসর্জন দেওয়া, সেটা তিনি সহজে পেরেছিলেন; কিন্তু দ্বিতীয়টার মধ্যে জীবনের গভীরতর তাৎপর্যের কাছে খাঁটি থাকার প্রশ্ন ছিল। এর সমাধান সহজ হয়নি, এটি আদর্শের প্রশ্ন, ধর্ম-রক্ষার প্রশ্ন। এর মূল্য প্রতি পদে, প্রত্যেক অবস্থাচক্রে স্বতন্ত্র ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে দিতে হয় মর্মমূলে অবিরত রক্তক্ষরণের মধ্য দিয়ে। সেই যন্ত্রণা সহ্য করার এবং তার মধ্যে দিয়ে ধর্মনিরূপণ করে চলাই ভীষ্মকে তাঁর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইচ্ছামৃত্যু সূর্যের উত্তরায়ণের সঙ্গে ততটা যুক্ত ছিল না যতটা ছিল দশম দিনে পরস্পরবিরোধী কৃত্যের সমাধানে ক্ষতবিক্ষতচিত্ত বৃদ্ধের জীবন সম্বন্ধে চূড়ান্ত, যথার্থ অনীহা জাগার লগ্নের সঙ্গে। অন্তরে শেষ বিন্দু রক্ত ক্ষরিত হওয়ার পর তিনি নিজেকে জীবনের কাছে ঋণমুক্ত বলে দাবি করতে পারলেন, জীবিত থাকার দায় থেকে মুক্তি পেলেন— নিজেরই কাছে।

মহাভারতের রচয়িতা বেদব্যাস ও তাঁর পুত্র শুকের বিবরণ আছে মহাভারতের শান্তিপর্বে।[১৪] দেবীভাগবত পুরাণে পড়ি ঋষি পরাশরের পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন— জন্মক্ষণেই পিতামাতার আশ্রয়চ্যুত। তিনি হিমালয়ে দীর্ঘকাল তপস্যা করেন। একবার দেখতে পান কলবিঙ্ক পক্ষী দম্পতি তাদের শাবকদের খাওয়াচ্ছে। দেখে তাঁর অপত্যলাভের বাসনা হয়; কিন্তু স্ত্রী নেই, কী করে সন্তান পাবেন তাই ভাবতে থাকেন। সেই সময় অপ্সরা ঘৃতাচীকে দেখে কামার্ত হন, সেই স্খলিত বীর্য থেকে পুত্র শুকের জন্ম। শুক বৃহস্পতির কাছে বিদ্যালাভ করেন, পিতার কাছে আসেন এবং বিবাহ করে পিতার সঙ্গেই বাস করেন। কিন্তু এক সময়ে তপস্যা করতে করতে সশরীরে আকাশে উঠে যান। ব্যাস খোঁজাখুঁজি করেন, কিন্তু প্রতিধ্বনি মাত্র শুনতে পান, শুককে আর পান না। তখন শিব এসে সান্ত্বনা দিলে ব্যাস আশ্রমে ফিরে যান। অর্থাৎ ব্যক্তিগত জীবনে ব্যাস পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, বন্ধু, স্ত্রী কিছুই পাননি। অলৌকিক ভাবে এক পুত্র লাভ করেন, সে তার বিবাহোত্তর জীবনে কিছুকাল পিতার সঙ্গে বাস করে, কিন্তু কিছুকাল পরে ব্যাস তাকেও হারান।

মহাভারতে ব্যাসের মাতা সত্যবতীর সঙ্গে শান্তনুর বিবাহ হলে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য দুই ভাই জন্মায়। তাদের সঙ্গে ব্যাসের সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল না। সত্যবতীকে বলেছিলেন, তিনি স্মরণ করলে ব্যাস উপস্থিত হবেন। হলেন যখন চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য মৃত এবং দুই বিধবা অম্বিকা অম্বালিকার কোনও পুত্র নেই। হস্তিনাপুর সিংহাসনে উত্তরাধিকারী হবেন সত্যবতীর পুত্র— রাজমাতা হওয়ার এই উদগ্র কামনায় শান্তনুর জ্যেষ্ঠ সন্তান গঙ্গার পুত্র দেবব্রতকে নির্মম ভাবে বঞ্চিত করেন, কঠোর চিরকৌমার্যের প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন ভীষ্ম। কিন্তু তাঁর দুই পুত্রেরই নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু ঘটেছে, অতএব যে সন্তানকে জন্মক্ষণে বিসর্জন দিয়েছিলেন এই একান্ত প্রয়োজনের মুহূর্তে তাকেই স্মরণ করলেন সত্যবতী। তাপস ব্যাস দেখা দিতে সত্যবতী বললেন ভ্রাতৃবধূ দুটিতে পুত্র উৎপাদন করতে। এ নিয়োগ শাস্ত্রসম্মত, কিন্তু ব্যাস জানতেন কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কুৎসিত আকৃতি বিকর্ষণ ঘটাবে ওই রাজবধূ দুটির চিত্তের। তাই সত্যবতীকে বললেন, তারা যেন এক বৎসর শুচিব্রতা হয়ে থাকেন। কিন্তু সত্যবতী বিলম্বে অসম্মত, তখন ব্যাস ঘৃণার্হ, অবাঞ্ছিত পুরুষরূপে দুটি নারীর গর্ভাধান ঘটালেন। পরে এক দাসী তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। জন্ম হল অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র, বিবর্ণ পাণ্ডু এবং শান্ত, দান্ত ধার্মিক বিদুরের।

কলবিঙ্ক শাবকদের প্রতি মা-পাখি বাবা-পাখির অপত্যস্নেহের প্রকাশ দেখে যাঁর অপত্যবাসনা জাগে তিনি বিনা দাম্পত্যে অপত্যের জনক হলেন; অলৌকিক ভাবে শুকের এবং দুই অনিচ্ছুক রমণীর ও একটি নম্রমধুর দাসীর সঙ্গে স্বল্পক্ষণের সংযোগে। পত্নীপ্রেম তাঁর ভাগ্যে জোটেনি; পুত্র শুকের দাম্পত্য জীবন কাছে থেকে কিছুকাল দেখেছিলেন মাত্র, তা সে শুককেও অকালে হারালেন।

১৪. শান্তিপর্ব; (৩১১-৩১৪ অধ্যায়)

গান্ধারী যখন একটি মাংসপিণ্ড প্রসব করেন এবং কুন্তির পুত্রভাগ্যে ঈর্ষান্বিতা হয়ে সে পিণ্ডটিকে নষ্ট করতে উদ্যত হন তখন ব্যাস সেটিকে একশত এক খণ্ডে ভাগ করে শত কৌরব পুত্র ও কন্যা দুঃশলার ভ্রূণে বিন্যস্ত করেন। নিজে অপত্নীক। কলবিঙ্ক শাবকদের দেখার পর থেকে অপত্যস্নেহ তিনি ইতস্তত বিতরণ করেছিলেন। স্নেহমমতা তাঁর সহজাত বৃত্তিই ছিল। পাণ্ডুর অকালমৃত্যু ও মাদ্রীর সহমরণের পরে ব্যাস এসে কুন্তিকে সান্ত্বনা দেন। বনবাসকালে পাণ্ডবদের একচক্রা নগরীতে বাসের ব্যবস্থা করে দেন এবং দ্রৌপদী-স্বয়ংবরে যাওয়ার জন্যে তাদের পরামর্শ দেন।[১৫] যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় ব্যাস উপস্থিত থাকতেন এবং রাজসূয় যজ্ঞ সমাধা হলে পর যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন।[১৬] পাণ্ডবদের বনবাসকালে যখন দুর্যোধন পক্ষ তাদের বিনাশে বদ্ধপরিকর, তখন ব্যাসই দুর্যোধনদের নিরস্ত করেন।[১৭] যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের ধারাবিবরণী শোনাবার জন্যে তিনিই সঞ্জয়কে দিব্যদৃষ্টি দেন।[১৮] ভীষ্ম যখন শরশয্যায় শায়িত, তখন ব্যাস এসে কিছুক্ষণ ভীষ্মের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ করে যান।[১৯] যুদ্ধে এক সময় যুধিষ্ঠির খুব উদভ্রান্ত বোধ করলে ব্যাস এসে তাঁকে নানা সান্ত্বনাবাণী শোনান। যুদ্ধান্তে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য যখন প্রচুর বিত্তের প্রয়োজন হল; তখন ব্যাসই এসে রাজা মরুত্তের গোপন বিত্তরাশির সন্ধান দেন।[২০]

ঘটোৎকচের মৃত্যুর সংবাদে যুধিষ্ঠির যখন নিরতিশয় ব্যাকুল, তখনও ব্যাস এসে যুধিষ্ঠিরকে নানা ভাবে আশ্বস্ত করেন। স্ত্রীপর্বে পুত্র-শোকাতুরা গান্ধারী সকল পাণ্ডবকে অভিসম্পাত দিতে উদ্যত হলে ব্যাস এসে তাঁকে নিরস্ত করেন।[২১] যুদ্ধান্তে যে পাপবোধে যুধিষ্ঠির ভারাক্রান্ত বোধ করছিলেন তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে ব্যাসই যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে পাপনাশ করার পরামর্শ দেন।[২২] ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তি, ও বিদুর যখন বনগমনে উদ্যত, তখনও ব্যাস এসে তাঁদের সান্ত্বনা ও আশ্বাস দেন।[২৩] অলৌকিক শক্তির প্রয়োগে সমস্ত মৃত সৈনিকদের এক রাতের জন্যে পরলোক থেকে মর্তে নিয়ে আসেন ও বহু ক্ষত্রিয় নারী তখন গঙ্গায় প্রাণত্যাগ করে স্বামীদের সান্নিধ্যে চলে যান।[২৪] যদুবংশ যখন

১৫. আদিপর্ব; (১৫৭:১৫)
১৬. সভাপর্ব; (৪৯:১০)
১৭. আরণ্যকপর্ব; (৮:২৩)
১৮. ভীষ্মপর্ব; (২:৮, ৯)
১৯. শান্তিপর্ব; (৪৭:৫)
২০. আশ্বমেধিকপর্ব; (৩:২০)
২১. স্ত্রীপর্ব; (১৩:৭)
২২. আশ্বমেধিকপর্ব; (৩:৯)
২৩. আশ্বমেধিকপর্ব; (২:২০; ৩:১-৫)
২৪. আশ্রমবাসিকপর্ব; (৪১:২১-২৪)

ধ্বংস হচ্ছিল তখন অর্জুন ব্যাসের কাছেই আসেন কী করণীয় সে বিষয়ে পরামর্শ করতে।[২৫] অনুশাসন পর্বে দেখি একটি কীট শকটের নিচে চাপা পড়তে যাচ্ছিল, ব্যাস তাকে বাঁচান ও সে পরজন্মে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মায়। জীবের প্রতি মমতা ব্যাসের সহজাত বৃত্তি এবং মহাকাব্য রচয়িতার পক্ষে এটি যে একটি অপরিহার্য গুণ তা দেখবার জন্যেই যেন এ ঘটনার উল্লেখ। শেষ জীবনে ব্যাস আবার তাঁর প্রথম সাধনস্থান হিমালয়েই ফিরে যান এবং তপস্যায় মগ্ন হন। ব্যাসের মৃত্যুর কথা শাস্ত্রে লেখে না।

চারটি বেদের বিভাজন, সমস্ত মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণের রচনা ব্যাসেরই কৃতি— এ কথা বলা হয়। স্পষ্টই বোঝা যায়, কোনও একজন মানুষকে এতগুলি কাজ করতে হলে তাঁকে প্রায় আড়াই হাজার বছর বেঁচে থাকতে হয়, এবং ব্যাস যে তেমনই বেঁচে ছিলেন তার কোনও উল্লেখ কোথাও নেই। তা হলে দাঁড়ায়, ব্যাস একটি সংজ্ঞা মাত্র, যিনি বেদভাগ না করলেও মহাভারতের রচয়িতা বলে তাঁকে স্বীকার করা হয়ে থাকে। আমরা জানি, মহাভারত মূল রচনা ও অন্তত দু-তিনটি প্রক্ষিপ্ত অংশের সংকলনে নির্মিত, এর শেষতম রূপায়ণের সঙ্গেই রচয়িতা হিসেবে ব্যাসের যোগ। বেদ এবং পুরাণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক না থাকাই সম্ভব, যদি না বেদবিভাজন ব্যাপারটি মহাভারতের সমকালীন হয়ে থাকে।

এতগুলি গ্রন্থের রচয়িতা বলে ব্যাসকে চিহ্নিত করবার উদ্দেশ্য স্পষ্ট; তাঁর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে পাঠকের শ্রদ্ধা জাগানো। মহাভারত পড়ে পাঠক শ্রদ্ধায় অভিভূত হন, কিন্তু সে শুধু তাঁর পাণ্ডিত্যে নয়, তাঁর প্রজ্ঞায়, তাঁর ভূয়োদর্শিতায়। পাঠকের এই ব্যাপারে একটা দ্বিধা থেকে যায়: যে মানুষটি বিবাহ করেননি, সংসারের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যাঁর পুত্র শুকের সংসার মাত্র কিছুকালের জন্যে কাছ থেকে দেখা, যিনি রাজপ্রাসাদে থেকে মূলত অসম্পৃক্ত, কেননা ব্যক্তিগত কোনও বন্ধনই তাঁর ছিল না, তিনি কেমন করে জীবনের এত বৈচিত্র্যের সন্ধান দিলেন? মহাভারত নিজের সম্বন্ধে বলেছে, 'যা এখানে নেই তা কোথাওই নেই।'[২৬] এ কথা বহু দূর পর্যন্ত আক্ষরিক অর্থেই সত্য। কিন্তু ব্যাস কেমন করে এত গভীর এবং এত ব্যাপক ভাবে জীবনকে জানলেন? তিনি শোকে সান্ত্বনা দিয়েছেন বার বার, এমনকী শোকে আপ্লুত হয়ে অশ্রুপাতও করেছেন, পাণ্ডবদের মঙ্গল কামনা করে পরামর্শ দিয়েছেন বারে বারে, কৌরবদের বলেছেন সর্বনাশের পথে না গিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করতে। অর্থাৎ তিনি কৌরব-পাণ্ডবদের ভাগ্যভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। কিন্তু এগুলি ত মানবহিতৈষা, তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলি সম্বন্ধে মহাভারত প্রায় নীরব। পরাশরকে তিনি চোখেই দেখেননি, সত্যবতীর সঙ্গে মাতাপুত্র সম্পর্ক ধরে এমন কোনও আলাপ নেই যার থেকে সত্যবতীর অপত্যস্নেহ বা ব্যাসের মাতৃভক্তির কোনও নিদর্শন পাই। তিনি জননীর

২৫. মৌষলপর্ব, পুরো অধ্যায়

২৬. যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ। আদি (৫৬:৩৩)

আজ্ঞা পালন করেছেন, কিন্তু সেটা ত কর্তব্য, জননীকে ভালবেসে বা ভক্তি করে তা করেছেন এমন কোনও প্রমাণ নেই। শুকের সম্পর্কেও খবর মেলে দেবীভাগবত পুরাণে— মহাভারত তাঁর সম্পর্কে প্রায় নীরব। সেখানে শুধু শুনি আর পাঁচজন শিষ্যের সঙ্গে শুকও তাঁর কাছে বিদ্যালাভ করেছেন ও মহাভারত শুনেছেন।[২৭] পিতাপুত্রের ব্যক্তিগত সম্পর্ক কোথাও চিত্রিত হয়নি। তা হলে ব্যক্তিগত, পারিবারিক মানবিক সম্পর্কগুলির মধ্যে ব্যাসকে দেখানোই হয়নি, অথচ ব্যাস সারা মহাভারত জুড়ে বিস্তর মানবিক সম্পর্কের আলেখ্য আঁকলেন। পাঠক বিব্রত বোধ করেন: ব্যাসের জীবন এমন নিরালম্ব রূপে দেখানো হল কেন? রামায়ণের শুরুতে এবং গোটা উত্তরকাণ্ডে বাল্মীকি স্পষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় বর্তমান এবং সেখানে তিনি কঠোর তপস্বী, সীতার স্নেহপরায়ণ পালকপিতা, লবকুশের আচার্য এবং সীতা ও তাঁর সন্তানদের প্রতি মর্মান্তিক অবিচার করার জন্যে কঠিন শপথ করে রামকে ধিক্কার দিচ্ছেন। এখানে কোথাও কোনও বিরোধ নেই। সীতা ও লবকুশ ছাড়া কোনও মানবিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে উপস্থাপিত করা হয়নি, যেখানে তিনি দেখা দিচ্ছেন সেখানে তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ অবিভক্ত।

ব্যাস কিন্তু নানা ভাবেই জটিল। কী ভাবে ব্যাসকে দেখব? তাঁর জীবনের দীর্ঘকাল কেটেছে তপস্যায়। জীবনের নানা পর্ব সম্বন্ধে তাঁর উপদেশ, কিন্তু জীবনকে তিনি ব্যক্তিজীবনের পরিসরে তো দেখলেনই না, সে সম্বন্ধে এত উপদেশ দেওয়ার অধিকার তাঁর জন্মাল কী ভাবে? তখন পাঠককে মনে করতে হয়, অসম্পৃক্ত থাকলে প্রবহমান সংসারের জীবন থেকে যে দূরত্ব থাকে সত্যকার চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকে তা এক ধরনের তৃতীয় নেত্র দেয়; সে এক পূর্ণতর দৃষ্টি পায়, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যা আবিল হয়নি। দূর থেকে অন্যদের জীবন দেখে মনের গভীরে তাকে বিশ্লেষণী উপলব্ধির দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারলে যে দেখা, সে শুধু সত্য দেখা নয়, ব্যাপ্তিমান স্থায়ী দেখা, তাৎক্ষণিকের দ্বারা সীমিত নয়। শাস্ত্রে তাই বলে 'কবিঃ ক্রান্তদর্শী'— কবির দৃষ্টি বর্তমান কাল ও অব্যবহিত পরিস্থিতিকে পেরিয়ে দেখতে পায়।

ব্যাসের চরিত্রে অন্য যে ব্যাপারটি পাঠকের প্রতিক্রিয়াকে দ্বিধার মধ্যে আনে তা হল ব্যাসের দুটি আচরণ। প্রথম, ব্যাস ঋষির পুত্র, স্বয়ং তপস্বী। কিন্তু রাজপ্রাসাদের, অন্যায় পাশা খেলায় যুধিষ্ঠির একের পর এক যা যা বাজি রেখে হারছেন তার অনেকটাই যে যুধিষ্ঠিরের অনধিকারের সীমায় তা তিনি নির্দেশ করলেন না। এর ফলে প্রকাশ্য রাজসভায় রাজনন্দিনী, রাজকুলবধূর মর্মান্তিক লাঞ্ছনা ঘটল, ঋষির বিবেক তা নিষ্প্রতিবাদে দেখল। এইখানে ব্যাসের প্রথম ও প্রধান অপরাধ, বাকি অপরাধগুলি এর থেকেই এসেছে। কৌরবদের তিনি ভর্ৎসনা করেছেন, কিন্তু যুদ্ধ নিবারণ করতে প্রয়াসী হননি। সারা যুদ্ধকাণ্ড ব্যাপ্ত করে দেখি, ব্যাস দ্বিমনা, তাঁর আনুগত্যও যেন দ্বিধাগ্রস্ত। তাঁর অন্তরের পক্ষপাতিত্ব যে পাণ্ডবদের

২৭. দেবীভাগবত (১:১৪), হরিবংশ (১:১৮:৫১)

পক্ষে, এতে কোনও সন্দেহ থাকে না; কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু দুজনেই তাঁর ঔরস সন্তান (নিয়োগের বলে)। এদের মধ্যে তিনি পক্ষপাতশূন্য আচরণ করতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু পারেননি, যা বিবেকবান ঋষির পক্ষে অন্যায়। যুযুৎসু বা বিদুর যে নিরপেক্ষতা দেখিয়েছেন, ব্যাস তা পারেননি। তাঁর বিবেক দ্বিধাগ্রস্ত। মহাভারত-প্রণেতা ঋষিকবি সম্বন্ধে পাঠকের কী প্রতিক্রিয়া হবে? তাঁকে বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত করবে, না তাঁর বিচারে বিমুখ থাকবে? এই ব্যাপারটা পাঠককে রীতিমত ব্যাকুল করে এবং ধীরে ধীরে চরম এক প্রত্যয়ে পৌঁছে দেয়; তা হল: কেবলমাত্র মর্মান্তিক আততি থেকেই মহৎ সৃষ্টি সম্ভব। ব্যাস যদি সরলরৈখিক চরিত্র হতেন, বাল্মীকির মতো শুধু শেষ পর্বে অপমান ও প্রত্যাখ্যান পেতেন তা হলে তাঁর সৃষ্টিও রামায়ণের মতোই সরল হত, পাঠকের প্রতিক্রিয়াতে এত জটিলতা বা যন্ত্রণা থাকত না। কিন্তু ব্যাসের জীবন, উপলব্ধি, আন্তর-সংঘাত সবই তাঁকে ধীরে ধীরে মহৎ সৃষ্টির স্রষ্টায় পরিণত করেছিল, তাই পাঠকের পক্ষে তাঁর জীবন বা সৃষ্টি কোনওটারই প্রতি সাড়া দেওয়া সহজ হয় না— এত মহৎ, এত দুরূহ, এত ঐশ্বর্যবান মহাকাব্যে সাড়া দেওয়াও সে জন্যে বহু মর্মযন্ত্রণা, বোধ ও বোধির বহু যাতনাময় স্তর পেরিয়ে তবেই সম্ভব। এ মহাকাব্যের জনপ্রিয় হওয়ার কথাই ওঠে না: মানস ক্লেশে দীর্ণ, জীবনের উপলব্ধিতে ঋদ্ধ, ধর্মবোধে ভাস্বর যে পাঠক এ মহাকাব্য তারই প্রিয়। সংখ্যায় তারা অল্প, কিন্তু তাৎপর্যে তারা গরীয়ান।

•

সংশয়ের উজ্জ্বলতা

সারা পৃথিবীতে বেশ কিছু মহাকাব্য রচিত হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের ব্যাবিলনীয় মহাকাব্য *গিলগামেশ* থেকে যদি খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের ভার্জিলের কাব্য পর্যন্ত ধরি তা হলে এগুলি সংখ্যাতেও কম নয়। কালের ব্যাপ্তিতেও বিপুল। সাধারণত মহাকাব্যকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়: প্রাথমিক পর্বের, *গিলগামেশ*, হোমার, ব্যাস, বাল্মীকি; আর দ্বিতীয় পর্যায়ের, ওভিদ, ভার্জিল, প্রভৃতি। ভারতবর্ষের দুটি মহাকাব্যই প্রাথমিক। এই ধরনের মহাকাব্যের কতকগুলি স্বতন্ত্র লক্ষণ থাকে। এগুলির রচয়িতা সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। *গিলগামেশ*-এর রচয়িতার নামই জানা যায় না; হোমার বা ব্যাস বাল্মীকি সম্বন্ধে যা জানি তার প্রামাণ্যতা সংশয়িত, কেননা তা অনেক পরবর্তী যুগের, বা সম্ভবত তাঁদেরই রচনার প্রক্ষিপ্ত অংশের থেকে সংকলিত। কাজেই রচয়িতার অনামিক কিংবা কিংবদন্তী-নির্ভর হওয়াটা একটা লক্ষণীয় ব্যাপার। এর একটা সম্ভাব্য কারণ হল, প্রাথমিক মহাকাব্যকাররা নিজেদের যথাসম্ভব নেপথ্যে রেখে কাব্যে তাঁদের দেশের ও কালের এমন একটা পর্বের কথা বলেন যখন তাঁদের জাতীয় জীবনের কোনও ঘটনা বা ঘটনাবলি কবির লেখনীর সাহায্যে অমরতা দাবি করে। এই কবিরা যেন সমস্ত জাতির হয়ে ইতিহাসের কাছে দায়বদ্ধ থেকে মহাকাব্যগুলি রচনা করেন।

কেন? কী তাঁদের প্রেরণা দেয়? শুধু কি কোনও কাহিনিকে অবলম্বন করে কাব্য রচনাই এঁদের উদ্বুদ্ধ করে? তেমন বহু কাহিনি তো লোকমুখে ভ্রাম্যমাণ থাকে দীর্ঘকাল, দূরদূরান্তরে গাথাসাহিত্যের আকারে। মহাকবি কাহিনিগুলিকে উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেন মাত্র, নিজস্ব সংযোজন দিয়ে। তা হলে কাহিনি ও গাথার অতিরিক্ত কিছুই তাঁদের উপজীব্য, যাকে মহাকাব্যের মধ্যে দিয়ে সাধারণ্যে নিবেদন করাই তাঁদের উদ্দেশ্য। এই অতিরিক্তটুকু কী? জাতীয় জীবনের কোনও ঘটনা-সম্পাত বিশেষ মুহূর্তে মহাকবির চিত্তে এমন এক আলোড়ন সৃষ্টি করে যাতে তাঁর আবাল্য-অভ্যস্ত সমাজ-স্বীকৃত সব মূল্যবোধের শিকড়ে টান পড়ে; এতে আবার সব কিছু নিয়ে নতুন করে বোঝাপড়া করতে হয় নিজের সঙ্গে— সমকালীন সমস্ত স্বদেশবাসীর প্রতিভূ হয়ে; এই বোঝাপড়ার শেষ নির্যাসটুকু তুলে দিতে হয় দেশবাসীকে; সেই সময়, এই কারণ এবং প্রক্রিয়াতেই, জন্ম নেয় মহাকাব্য। কাজেই মহাকাব্যে কবি গৌণ,

দেশবাসীরাও ব্যক্তি হিসেবে গৌণ। যে সকল ঘটনার অভিঘাতে কবি অনুপ্রাণিত হয়েছেন, মহাকাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনা হিসেবে সেগুলিও গৌণ। এ সকলের সমাবেশে জনজীবনে যে সংঘাতের সূচনা হয়েছে, যার সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ অস্ফুট ভাবে সচেতন, কবি সেই সংঘাতকে আত্মস্থ করে তাকে অর্থবহ রূপ দেন মহাকাব্যে। তখন পাঠক বা শ্রোতা মহাকাব্যের মধ্যে খুঁজে পান মূল্যবোধের সংক্ষোভে বিচলিত তাঁর আপন চিত্তের প্রতিরূপ, তাঁর কিছু সংশয়ের সমাধান, কিছু বা নতুন প্রশ্ন যা তাঁকে ভাবাবে এবং উন্নততর জীবনবোধের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

এ কথা সত্য যে, মানুষ স্বেচ্ছায় মূল্যবোধের বিরোধে সংক্ষুব্ধ হতে চায় না। পারলে সে অভ্যস্ত পরিবেশের অভ্যস্ত মূল্যবোধের আবহে শান্তিতে, নির্দ্বন্দ্বে জীবন অতিবাহিত করতে চায়। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই করেও থাকে। কিন্তু মূল্যবোধের সংকট কারও কারও জীবনে আসে। যেমন দশরথের সামনে দুটি শ্রেয়োনীতির বিকল্প ছিল: কৈকেয়ীকে বরদানের প্রতিশ্রুতি এবং জ্যেষ্ঠপুত্রের সিংহাসন অধিকার সমর্থন করা। লক্ষ্মণ, কৌশল্যা, এঁদের কথায় এটি স্পষ্ট বোঝা যায়। জরাগ্রস্ত, বিকলচিত্ত দশরথ ওই দ্বন্দ্বের সামনে এসে এত বিহ্বল হয়ে পড়েন যে, তাঁর সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে সিন্ধুমুনির অভিশাপের উপাখ্যান উদ্ভাবন করতে হয়েছে, যার ফলে দশরথের নৈতিক সিদ্ধান্তের গুরুত্ব আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে অতিলৌকিকের দ্বারা। কিন্তু আসলে দুর্বলচিত্ত রাজা কৈকেয়ীর অন্যায় দাবি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না— একদা তাঁর প্রতি অত্যধিক আসক্তি ছিল বলে, এবং এই আপৎকালে তার অনর্থ করবার প্রচণ্ড শক্তি জানতেন বলে। তাঁদের দাম্পত্য সম্পর্কের বাসরে রাষ্ট্রের মঙ্গলের যুক্তি ও জ্যেষ্ঠের অগ্রাধিকার যে সমগ্র প্রজাকুলের কাছে রাজার অকথিত অঙ্গীকার— এ কথা বলবার নৈতিক সাহস দশরথ খুঁজে পেলেন না। তেমনই স্নেহময় পিতা যখন রামকে ডেকে পাঠিয়ে অভিষেকের পরিবর্তে চতুর্দশ বৎসরের জন্যে বনে নির্বাসনের সংবাদ দেন তখন দেখা দেয় অনাশঙ্কিত সংঘাত: রাম জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসাবে রাজ্যাধিকার দাবি করবেন, না পিতার নির্দেশ মেনে নেবেন? পরে আবার সবার অলক্ষ্যে নির্বাসনভূমিতে যখন ভাই ভরত এসে রাজ্য প্রত্যর্পণ করবার জন্যে মিনতি করেন তখন পুনর্বার সে সংকটের মধ্যে পড়তে হয় তাঁকে।

এ কোন সংকট? শুধু শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্ব নয়, দুটি ন্যায়সংগত বিকল্পের মধ্যেই বিরোধ। ভরতের অনুরোধে রাজ্য গ্রহণ করলে রাম পিতৃ-সত্য রক্ষা না করার অপরাধে অপরাধী হন না। কারণ, পিতার নির্দেশে বনে যাওয়াতেই তো পিতৃ-সত্য রক্ষা করা হয়েছে। বিমাতা যাঁকে রাজা করতে চান তিনি স্বয়ং যদি জ্যেষ্ঠকে রাজ্য দিতে চানই তাতে তো পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয় না। এখানে দুটি মূল্যবোধের সংঘর্ষ। এমন ঘটনা মানুষের জীবনে মাঝে মাঝেই ঘটে। রাবণের অন্তঃপুরে সীতা হনুমানের দেখা পাবেন এবং রাম তাঁকে উদ্ধার করবেন এমন আশ্বাসের নিশ্চয়তা দূরে থাক, সম্ভাবনাই ছিল না। সে অবস্থায় দু' মাস পরে তাঁকে মেরে ফেলা হবে জেনেও রাবণের প্রস্তাবে যখন তিনি সম্মত হননি, তখন রামের

প্রতি প্রেম ও আনুগত্য লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রতিষ্ঠিত হল। এর পরে বাল্মীকি স্বয়ং যখন রামের যজ্ঞক্ষেত্রে এসে বলেন যে, সীতা যদি কায়মনোবাক্যে রামেরই প্রতি অনুরক্তা না হয়ে থাকেন, তা হলে তাঁর বহু সহস্র বৎসরের তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনের কোনও ফলই যেন তিনি না পান। তখন রামের সম্মুখে দুটি শ্রেয়ের বিরোধ দেখা দেয়: প্রজারঞ্জন ও মহর্ষি বাল্মীকির বাক্যে আস্থা স্থাপন করে প্রকাশ্যে সীতার শুচিতা ঘোষণা করে তাঁকে গ্রহণ করার বিকল্প। দুটিই ধর্মসংগত। কাজেই মূল্যবোধের সংঘাতে যে নৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রশ্ন, তা শেষ পর্যন্ত ধর্মসংকটের রূপেই দেখা দেয়। শুধু শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্ব হলে ধর্ম ও অধর্মের বিরোধেই তা পর্যবসিত হত, ধর্মসংকট হত না। নীতি ও দুর্নীতির মধ্যে বিকল্পগুলির গ্রহণ-বর্জন অনেক বেশি সহজ ও সরলরৈখিক।

রামায়ণে এ ধরনের সংকট বেশি নেই বলেই রামায়ণের জনপ্রিয়তা সহজে এসেছে এবং বেশি ব্যাপক ও স্থায়ী হয়েছে। পারিবারিক সম্পর্ক, দাম্পত্য, সৌভ্রাত্র্য, বন্ধুকৃত্য, পরিবারের মর্যাদারক্ষা, শত্রুনিপাত ও তার বাইরে প্রজারঞ্জনের একটা অস্পষ্ট মহনীয়তা—এই সবই রামায়ণের মূল্যাবোধে সংকট এনেছে এবং এগুলির অধিকাংশেরই নিষ্পত্তি হয়েছে শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্ব হিসেবেই।

মহাকাব্যে শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্বও থাকে, কিন্তু তাতে মহাকাব্যের যথার্থ চরিত্র নিরূপিত হয় না। ধৃতরাষ্ট্র যখন অপত্যস্নেহ ও রাজকৃত্যের মধ্যে অন্ধ পিতৃস্নেহকে প্রাধান্য দেন তখন আপামর-সাধারণ তাঁর রাজকর্তব্যে ঔদাসীন্য বা অবহেলাকে নিন্দা করেন, কারণ শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্বে তিনি নৈতিক ভাবে পরাজিত। ওই একই দ্বন্দ্বে গান্ধারী পরাজয় স্বীকার করেননি। যে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে শৈশবে স্নেহে লালন করেছেন, যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে আশীর্বাদপ্রার্থী সেই পুত্রের জয়কামনা করতে পারেননি।[১] না পারার জন্যে তাঁর মাতৃহৃদয় বেদনাদীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু এই অপেক্ষাকৃত সরল দ্বন্দ্বে তাঁর একটি পক্ষ বেছে নেওয়া তত কঠিন ছিল না, কারণ, এ দ্বন্দ্ব দুই মেরুর মধ্যে সাদা-কালোর মতোই স্পষ্ট। কিন্তু দ্যূতসভায় যখন নীরবে কৌরব মহারথীরা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ দেখেন তখন তাঁদের সামনে দুটি বিরুদ্ধ মূল্যাবোধের সংঘর্ষ ছিল। দুটিরই সপক্ষে যুক্তি ছিল। তাঁরা কৌরবের অন্নে প্রতিপালিত, কৌরবদের দ্বারা সংরক্ষিত, অতএব কৌরব-পক্ষ সমর্থন করার পক্ষে তাঁদের নৈতিক দায়বদ্ধতা ছিল। অপরপক্ষে এরও ওপরে ধর্মবোধ, যা নিঃসহায় রমণীর প্রকাশ্য, চূড়ান্ত অপমানের প্রতিকার করার স্পষ্ট পুরুষোচিত ও ক্ষত্রিয়োচিত কর্তব্যের দায়, জনমানসে সেটিরও নৈতিক সমর্থন ছিল। তেমনই যুধিষ্ঠিরের ক্ষত্রিয় কর্তব্য ও মানবিক কর্তব্যের মধ্যে যখন বিরোধ দেখা দিল, তখন তিনি যে শ্রেয়স্তর নীতিকে অবলম্বন করে আপাত ভাবে ক্ষত্রিয়ধর্মচ্যুত হতে সাহস করেছিলেন এখানেই তাঁর ধর্মসংকটে বিজয়ের প্রমাণ থেকে গেছে। এইখানে,

১. স্ত্রীপর্ব; (১৭:৫-৬)

এবং শুধুই এইখানে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কৌরবপক্ষের ঊর্ধ্বে ধর্মবিজয়ীর গৌরব পেলেন পাণ্ডবরা এবং পাণ্ডবপক্ষ হয়ে উঠল ন্যায়পক্ষ, ধর্মপক্ষ। পরবর্তী পর্যায়ে কৃষ্ণ মহিমা সংকীর্তনের জন্য আদিপর্বে যে সংযোজন, 'যেখানে কৃষ্ণ সেখানে ধর্ম, যেখানে কৃষ্ণ সেখানে বিজয়', এই দাবি অসার ও অশ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠে, কারণ ধর্মসংকট কৃষ্ণের সামনে আসেনি, এসেছিল পাণ্ডবদের সামনে, বারংবার, এবং নিষ্ঠুর বিকল্পের রূপ ধরে। সেইখানে পাণ্ডবরা বিজয়ী, যুদ্ধের শেষ পরিণতির অনেক আগে থেকেই। বকরূপী ধর্ম যখন যুধিষ্ঠিরকে বলেন, তিনি একটি মাত্র ভাইকে সঞ্জীবিত করতে পারেন, তখন যুধিষ্ঠির সকলের অগোচরে একটি সংকটের সম্মুখীন হন এবং অনায়াসে মহত্তর মূল্যবোধে প্রণোদিত হয়ে সহোদর ভাইয়ের পরিবর্তে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের নাম বলেন।[২] অর্জুন, যাঁর অস্ত্রবিদ্যা রণকৌশল সর্বজনবিদিত, তিনি যুদ্ধের পূর্বে ভ্রাতৃহত্যা, স্বজনহত্যার শঙ্কায় যখন বিচলিত হয়ে অস্ত্রত্যাগ করতে উদ্যত হন, তখন তিনি ধর্মসংকটের সম্মুখীন হয়ে উন্নততর বিকল্পকে আশ্রয় করতে চেয়েছিলেন। ধনঞ্জয়, সব্যসাচী, রণকুশল অর্জুনের চেয়ে এই অর্জুনের চরিত্র উজ্জ্বলতর। তাঁর এই হৃদয়দৌর্বল্য ক্ষুদ্র নয়, মহৎ। এই ইতস্তত করার মুহূর্তে তিনি পাণ্ডবপক্ষকে ধর্মসংকটের পরিপ্রেক্ষিতে মহত্তর মহিমায় মণ্ডিত করলেন। বিজয়ী যুধিষ্ঠির যে দিন সাশ্রুকণ্ঠে সিংহাসন প্রত্যাখ্যান করতে উদ্যত হলেন, সে দিন তাঁর নৈতিক জয় এমন এক মাত্রা লাভ করল যা আয়ত্ত করা লুব্ধ দুর্যোধনের পক্ষে বা দাম্ভিক কর্ণের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিজয়ের পর, রাজমাতা কুন্তি যখন পরাজিত পক্ষের সঙ্গে বনগমন করেন, তখন তাঁরও সামনে দুটি ন্যায়সংগত বিকল্প ছিল: তাঁর দুঃখী পুত্ররা বহুকষ্টে যে বিজয় লাভ করেছেন তার জন্যে তাঁদেরকে অভিনন্দিত করে তাঁদের সঙ্গে রাজমাতা হয়ে থাকা, যা ছিল প্রত্যাশিত এবং সম্পূর্ণ নীতিসঙ্গত, এবং বনাগমন। কিন্তু ওই ভিতরে-বাইরে সর্বস্বান্ত প্রাক্তন রাজদম্পতি বার্ধক্যের প্রান্তে এসে উক্ত-অনুক্ত লাঞ্ছনা ভোগ করবেন তাঁদেরই পূর্বতন গৌরবের শ্মশান হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে, বা গভীর নির্বেদে, আত্মগ্লানিতে বনে যাবেন এ তিনি কেমন করে সহ্য করবেন? এঁদের চেয়ে অনেক কম বয়সে তিনি নিজে বনবাসের ক্লেশ ভোগ করেছেন, তাই আর কিছু দিতে না পারলেও সাহচর্যটুকু দিতে উদ্যত হলেন। কুন্তির ধর্মসংকটের দুটি মেরুই বৈধ; কিন্তু দুঃখময়, বিকল্প বেছে নিতে পেরে তিনি ধর্মের নতুন এক ঔজ্জ্বল্যকে স্পর্শ করলেন।

২. আরণ্যক; (২৯৭:৬৬)

জীবনবোধের পুনর্মূল্যায়ন

কর্ণ যেদিন কুন্তির আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন সে দিন তাঁরও দুটি বিকল্পই ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুচির-প্রতীক্ষিত জননী মাতৃস্নেহ-বুভুক্ষু সন্তানকে আমন্ত্রণ করছেন জ্যেষ্ঠ কৌন্তেয়ের মর্যাদায়, আপন মাতৃস্নেহের আশ্রয়ে, একে স্বীকার করার মধ্যে অন্যায় ছিল না। সত্যই তো তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, জয়ী হলে অনুজ পাণ্ডবদের উর্ধ্বে তাঁর স্থান হত; এ গৌরব স্বীকার করলেও কোথাও সত্যের অপলাপ ঘটত না। প্রত্যাখ্যানের মধ্যে দীর্ঘ-সঞ্চিত অভিমান নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু আরও কিছু ছিল: অধিরথ এবং রাধার কাছে আশৈশবকাল যে স্নেহসিক্ত আশ্রয়ে লালিত, তার অমর্যাদা ঘটত। দাতা কর্ণেরও অদেয় ছিল কুন্তিকে এ দান। বীর কর্ণেরও অদেয় ছিল কুন্তিকে এ দান। বীর কর্ণ বীরের সদগতি থেকে ভ্রষ্ট হলেন না, সূর্যের সন্তান জ্যোতির্ময় আত্মত্যাগে শ্রেয়স্তর বিকল্প স্বীকার করে নিলেন, পরাজয় ও মৃত্যু অবধারিত জেনেও। এইখানেই কর্ণের মহত্ত্ব; প্রথম কৌরবপর্যায়ের মহাকাব্যের তিনিই তো নায়ক। সেই চরিত্র মেঘের পশ্চাতে বিদ্যুৎ-রেখার মতো মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে, তাই অক্লেশে ক্লেশবরণ করতে পারলেন। অখ্যাত, দুর্যোধনের আশ্রিত, সূতপুত্র, এই পরিচয় নিয়েই পৃথিবী ত্যাগ করতে সম্মত হলেন। তাঁর ধর্মসংকট তীব্র ও মর্মন্তুদ, তাই সেইখানে তাঁর ধর্মবিজয় এত গৌরবের।

ভুলে গেলে চলবে না যে, সব মহাকাব্যের নায়কই মানুষ, উপনায়ক ও প্রতিনায়করাও মানুষ। সংগ্রামটা দেবাসুরে নয়, মানুষে মানুষেই। এবং এই সংগ্রাম যখন চরিত্রগুলির মর্মে অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং তাঁদের এনে দাঁড় করিয়ে দেয় প্রায় সমান গুরুত্বের দুটি ধর্মগত বিকল্পের সামনে, তখনই তাঁদের চরিত্রবলের চূড়ান্ত পরীক্ষা। পরীক্ষা এই কারণে যে, যে কোনও বিকল্পই সমাজ ধর্মসংগত বলে স্বীকার করে নেবে— নীতিভ্রষ্ট বা অধার্মিক বলে দোষারোপ করবে না। বিকল্পগুলির ওজন আপাত ভাবে সমান বলেই সংকট, এবং আত্মত্যাগের পক্ষ, আপাত লাভের ও সমৃদ্ধির পক্ষ ত্যাগ করার মধ্যেই তাদের আত্মিক জয় নিহিত।

মহাকাব্য এ ভাবে ধর্মসংকটকে চিত্রিত করে কেন? মানুষ মহাকাব্যের কাছে কী প্রত্যাশা করে?— পথনির্দেশ। পাঠকশ্রোতাদের জীবনও ধর্মসংকট-সংকুল, বারে বারেই তাদের সামনে দুটি শ্রেয় পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বীর রূপে দেখা দেয়। এর মধ্যে যেহেতু কোনওটিই ধর্মাচরণের

নীতিবহির্ভূত নয়, তাই সংকট। আদর্শকে কত উচ্চে মানুষ স্থাপন করতে পারে এবং তার জন্যে কত মর্মযন্ত্রণার মূল্য দিতে পারে তারই নিরিখ ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করে মহাকাব্যের কেন্দ্র চরিত্রগুলি। ধর্মসংকটে যারা হার মানল তারা প্রতিনায়ক, মানুষের ধর্ম-জিজ্ঞাসা, ধর্ম-প্রত্যাশা সেখানে গিয়ে প্রতিহত হল। স্বার্থসন্ধানী, আত্মসুখপরায়ণ থেকেও কতকদূর পর্যন্ত ধর্মপথে থাকা যায়, কিন্তু এমন একটি গিরিশিখর আছে যা শুধু কঠিন দুঃখে অধিরোহণ করা যায় বলেই তার উচ্চতা, শুভ্রতা মানুষকে সম্ভ্রমে নত করে। ইচ্ছে করলে সে দুঃসাধ্য শৈলশিখরকে নীচে থেকে প্রদক্ষিণ করেও জীবনের পথ-পরিক্রমা সমাধান করা যায়। কিন্তু মহান যাঁরা তাঁরা ওই পথক্লেশের ভয়ে বিচলিত হন না, বরং স্বেচ্ছায় দুঃখবরণ করে ওই উত্তুঙ্গ শিখর অভিমুখে আরোহণ করেন। নিচের থেকে মানুষ ওই উধ্বর্গামী দুঃখসাধনব্রতী আদর্শনিষ্ঠ মানুষের পরিক্রমা চেয়ে দেখে। শ্বাপদ আছে, আছে পথের দুঃসহ একাকিত্ব ও নৈঃসঙ্গ্য; কিন্তু আন্তরবলে বলীয়ান, নৈতিক শৌর্যে দৃঢ়চিত্ত যে-মানুষ পথের এই সব বিপদ জেনে দুঃখময় পথ বরণ করেছেন, নিচের মানুষ তাঁদের দেখে পথনির্দেশ পায়, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় তারা আপন জীবনের ধর্মসংকটে কোন বিকল্পকে আশ্রয় করবে তার এক দিকনির্দেশ পায়।

এই পাওয়াটা সত্য হয়, কারণ মহাকাব্যের নায়কও দেবতা নয়, প্রতিপক্ষও অসুর নয়। মানুষের সংকটে মানুষই পথ দেখাতে পারে। নির্দোষ পাণ্ডবরা দ্বাদশবর্ষ বনে নির্বাসিত, রামলক্ষ্মণ-সীতাকে চতুর্দশ বৎসর বনবাসী দেখে নিষ্কারণে নির্যাতিত মানুষ শক্তি পায়। যখন দুটি নীতিনিষ্ঠ বিকল্পের দুরত্যয় সংকটের সামনে মানুষ এসে পৌঁছয় তখন মহাকাব্যের চরিত্রদের অনুরূপ বিপর্যয়কালের আচরণ দীপবর্তিকা হয়ে পথ দেখায়। নীতির সংকটে জীবনে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে; রোগ শোক ব্যাধি দৈন্যের চেয়ে অনেক বেশি এই নীতির সংকটের অন্ধকার। কিংকতর্ব্যবিমূঢ়তা মানুষের জীবনে পথচিহ্ন বিলোপ করে। তখনই মহাকাব্যের মানুষ-নায়ক পথভ্রষ্ট এই মানুষের অভিমুখে বাহু প্রসারিত করে, আত্মিক দীপালোকের পথে তাদের প্রবর্তনা দেয়। সে পথ দুঃখ ক্লেশে সমাকীর্ণ, এবং সেই কারণেই ধর্মসংকট হতে উত্তীর্ণ মানুষ গৌরবে আলোকিত। দুর্বল অনুগামী নিজেকে বলতে পারে, 'ধর্মাধর্মবিভ্রান্ত ওই মানুষটি যদি এত যন্ত্রণার মূল্যে শ্রেয়স্তরকে বরণ করতে পেরে থাকে, তবে আমিও পারি।' এবং টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়, পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় কঠিন পথে, কঠিন উত্তরণের গৌরবের অভিমুখে।

পরিশেষে, এই ধর্মসংকটগুলির যোগফল কী? কেন এগুলিকে মহাকাব্যে এ ভাবে উপস্থাপিত করা হয়? উদ্দেশ্য একটিই: জীবনবোধের পুনর্মূল্যায়ন। কতকগুলি বিশ্বাস ও মূল্যবোধ সমাজে ব্যাপ্ত থাকে, সেগুলি মানুষ উত্তরাধিকার-সূত্রে পায় এবং তা থেকে জীবনের পথসংকেত পায়। তার পর, সহসা কোনও অনাশঙ্কিত ঘটনায় পুরনো মূল্যবোধ হঠাৎ অর্থহীন, অচল হয়ে যায়। দুটি পরস্পরবিরোধী মূল্যবোধের সামনে তখন মানুষ দিগভ্রান্ত বোধ করে। তখন তার প্রয়োজন হয় নতুন মূল্যবোধের। এই প্রয়োজন ধর্মসংকটের; এমন বহু বিচিত্র ধর্মসংকটের সম্মুখীন হয়েছেন মহাকাব্যের চরিত্রেরা, এবং পরিবর্তিত পরিবেশে নিজেদের

আন্তর-বোধ ও শুভবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হয়ে প্রয়োজনীয় নতুন মূল্যবোধের সন্ধান পেয়েছেন। পাঠকশ্রোতা যখন জীবনের অনুরূপ সন্ধিক্ষণে দুটি বিরোধী নীতির মধ্যে নির্বাচন করতে বাধ্য হন তখন মহাকাব্যের নায়কের অনুরূপ অবস্থার সিদ্ধান্ত ও আচরণ তাঁকে পথ দেখায়। মানুষের জীবনের অন্তঃসংঘাতে মহাকাব্যের মানুষ-নায়কের সিদ্ধান্তই পথ দেখাতে পারে। তাই কৃষ্ণ মহাভারতের নায়ক হতে পারেন না। বন্ধুকে আত্মিক সংকট থেকে ত্রাণ করবার উপায় হিসেবে বিশ্বরূপ-দর্শন করানোর জাদু যাঁর আয়ত্তে আছে তিনি তো দেবতা, সর্বশক্তিমান; স্বল্পশক্তি মানুষ তাঁর কাছ থেকে কোনও নির্দেশ পায় না, কারণ মানুষের শক্তি সীমিত। তাই যুধিষ্ঠির নায়ক, কারণ বারে বারে তিনি অন্তর্দ্বন্দ্বে, মূল্যবোধের দ্বৈধতায় পীড়িত হন, দুটি বিপরীত নীতির সামনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় বোধ করেন, বহু যন্ত্রণার মধ্যে দ্বিধা নিরসনের জন্যে একটি মূল্যবোধকে বেছে নেন। এই সময়ে তিনি নৈতিক সংশয়ে মুহ্যমান সাধারণ মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান এবং মানুষ তাঁর কাছে সংকেত পায় নিজের মূল্যবোধের সংঘাতে সিদ্ধান্ত খুঁজে নিতে।

মহাকাব্যের মূল বিষয়গুলিই হল এই ধর্মসংকট। ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র ভিন্ন ভাবে এর সমাধান করেছে। ধর্মসংকট দুর্যোধনের কাছেও এসেছিল: পাণ্ডবদের উৎকর্ষ মেনে নেওয়া অথবা কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়ধর্মের অনুশাসন মেনে যুদ্ধ করে যাওয়া। তার পর একদিন এল বিরাটপর্বের শেষে, যখন পাণ্ডবদের উৎকর্ষ পরাজয় হানল দুর্যোধনের ওপরে। সে দিন দুর্যোধনের কী প্রতিক্রিয়া? বসে আছেন প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করা সংকল্প নিয়ে; তাঁকে সে দিন পথ দেখাল কে? কৃত্যারা; অর্থাৎ পাতালের মন্দশক্তি। ম্যাকবেথকে যেমন ডাইনিরা অর্ধ-সত্য অর্ধ-মিথ্যার প্রহেলিকা দিয়ে বিভ্রান্ত করেছিল ঠিক তেমনই কৃত্যারা দুর্যোধনকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে প্রতারণা করল।[১] মানুষ তাই নৈতিক সংকটে দুর্যোধনের আচরণ বা সিদ্ধান্ত থেকে কোনও যথার্থ অনুপ্রেরণা পায় না। পুরুষের অর্থাৎ যথার্থ মানুষের সংজ্ঞা দিয়েছে মহাভারত: 'যার পুণ্যকর্মের ধ্বনি আকাশ ও পৃথিবীকে স্পর্শ করে সে ততদিনই জীবিত থাকে যত দিন ওই ধ্বনি থাকে।'[২] আত্মিক শৌর্যে ঋদ্ধ নায়ক, দুরূহ ধর্মসংকটে যাঁর শুভবুদ্ধি তাঁকে মানুষের হিতকর সিদ্ধান্তের সন্ধান দেয়, তেমন নায়কের আচরণ আজও পথনির্দেশ করে শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্বে তো বটেই, কিন্তু তার চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ, দুটি শ্রেয়ের মধ্যে আনুপাতিক গুরুত্ব নির্ধারণ করে আপন আচরণকে তার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে। তাই মানুষ যুগে যুগে বারে বারে ফিরে আসে জীবনবোধের উৎস-সাহিত্য মহাকাব্যে। সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যই জীবনের পুনর্মূল্যায়নে প্রতিষ্ঠিত; এর আদিমতম সূচনা মহাকাব্য। এই কারণেই তা অমর।

১. ভীষ্মপর্ব; (২৪:৪-৮)
২. আরণ্যকপর্ব; ২৪০ পুরো অধ্যায়

রামায়ণ: সহজ পথরেখা

সব মহাকাব্যই কাব্য কিন্তু সব কাব্য মহাকাব্য নয়। মহাকাব্যের নিরিখ নানা সাহিত্যে নানা সংজ্ঞায় নিরূপিত হয়েছে। তবে, মোটের ওপর বিগত পাঁচ হাজার বছরের বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে দেখি মানুষ কতকগুলি কাব্যকে মহাকাব্য আখ্যা দিয়েছে, যদিও গুণগত মানে এগুলির মূল্য সমান নয়।

কাব্য সম্বন্ধে বরং একটা মোটামুটি ঐকমত্য আছে: যা মানুষকে চিন্তায় এবং/বা আবেগের ভূমিতে আন্দোলিত করে এবং জীবন সম্বন্ধে নতুন করে ভাবতে প্রণোদিত করে, তা-ই উচ্চস্তরের কাব্য। শুধুমাত্র বর্ণনা, বা যে-কোনও রস সৃষ্টি করে যা মানুষকে আপ্লুত করে তাকেও কাব্য আখ্যা দেওয়া হয়, কিন্তু মূল্যের পরিমাপে তার স্থান সাহিত্যে খুব উঁচুতে নয়। কাব্যের আঙ্গিক তার বহিরঙ্গ, যেমন ভাষা, অলঙ্কার, ছন্দ ইত্যাদি। সংস্কৃত সাহিত্য এ-বিষয়ে একটা সুস্থ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছে, ছন্দোবদ্ধ সৃষ্টিমাত্রকেই কাব্য বলেনি। ধর্মসূত্র, পুরাণ, ছন্দশাস্ত্র, অলংকারগ্রন্থ, কোষগ্রন্থ, এমনকী কিছু কিছু বিজ্ঞানগ্রন্থও ছন্দে রচিত; কিন্তু সংস্কৃত আলংকারিকরা সেগুলিকে কখনওই কাব্য বলেনি। অপর পক্ষে গদ্যে রচিত *কাদম্বরী* বা *হর্ষচরিত*-কে কাব্য বলা হয়েছে। কাজেই সংস্কৃতে বিষয়বস্তু বা বহিরঙ্গ দিয়ে কাব্যত্ব বা গদ্যত্ব নির্ণীত হয়নি, ভাব ও রস দিয়েই তা হয়েছে। অবশ্য এ সত্ত্বেও বহু তথাকথিত কাব্য বেশ অপকৃষ্ট রচনা, কষ্ট-কল্পিত, কৃত্রিম, অলংকার-বহুল; চমক সৃষ্টি করাই তাদের উদ্দেশ্য। তবু আঙ্গিকের ঊর্ধ্বে নিরিখের স্থাপনা করা হয়েছিল— এটিও প্রণিধানযোগ্য।

তা হলে প্রশ্ন আসে, মহাকাব্য কীসে মহাকাব্য হয়? সে আলোচনার পূর্বে বলে নেওয়া উচিত, মহাকাব্য প্রধানত দু'ধরনের হয়: আদি মহাকাব্য ও পরবর্তী যুগের মহাকাব্য। বস্তুত এই পরবর্তী যুগের মহাকাব্যও দু'শ্রেণির: চরিত্রগত ভাবে মহাকাব্য ও সংজ্ঞানির্ভর মহাকাব্য। আদি মহাকাব্যের উদাহরণ *গিলগামেশ, মহাভারত, রামায়ণ, ইলিয়াড, অডিসি* এবং সম্ভবত *ঈনীড*। গৌণ বা পরবর্তী কালে মহাকাব্যে প্রথম শ্রেণিটিতে পড়ে অশ্বঘোষ ও কালিদাসের কাব্য, মিলটনের মহাকাব্যদ্বয়, দান্তের মহাকাব্যত্রয়ী, গ্যেটের মহাকাব্য, কালেহ্বলা, নীবেলুঙ্গেনলীড, এল সিড, ইত্যাদি। এর দ্বিতীয় বিভাগের অন্তর্গত হল দণ্ডী, ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষের মহাকাব্য এবং ইয়োরোপে প্রাচীন মহাকাব্যের অনুসরণে কিছু রচনা। আদি মহাকাব্যের

পরবর্তী মহাকাব্যগুলিতে ওই প্রাথমিক মহাকাব্যের প্রভাব চোখে পড়ে, যেন আদি মহাকাব্যকে আদর্শ ধরে আরও সংহত পরিপাট্যে এগুলি রচিত। প্রাথমিক মহাকাব্যগুলির রচয়িতা সম্বন্ধে আমরা তাঁদের নাম ছাড়া কিছুই জানি না। *গিলগামেশ*-এর ক্ষেত্রে তাও জানি না। ব্যাস, বাল্মীকি, হোমারের জীবন, কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে কোনও তথ্যসূত্র কোথাও নেই। নীবেলুঙ্গেনলীড, কালেহ্বলা বা এল সিড সম্বন্ধেও এ কথা খাটে, কিন্তু মিলটন, দান্তে, গ্যেটের জীবনী আমাদের পরিচিত, এঁরা অনেকটা পরের যুগের বলেই হয়তো এঁদের ইতিহাস কিছু জানা যায়। ভারবি, মাঘ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না, তার কারণ অবশ্য ভারতবর্ষের সুবিদিত ইতিহাসবিমুখতা।

এই দ্বিতীয় শ্রেণির দুই বিভাগের মহাকাব্যেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু যেমন আছে, তেমনই আছে সচেতন ভাবে আঙ্গিক সৌষ্ঠব নির্মাণে কবিদের প্রয়াস, যা প্রথম পর্বের মহাকাব্যে নেই বললেই চলে। তা হলে কী আছে সেই আদি মহাকাব্যগুলিতে যা তাদের এমন অমরত্বে মণ্ডিত করেছে? *গিলগামেশ* সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যায়, সেই যুগকে আমরা এত কম চিনি যে, আঙ্গিক উপজীব্যে মিলে যে সাহিত্য নির্মাণ, তার সামাজিক ও মননগত পটভূমিকাটি আমাদের কাছে অপরিচিত। কিন্তু বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য, গভীরতা, মানবিক আবেগ ও আবেদন এবং মৃত্যুকে পরাস্ত করে অমরত্ব লাভ করবার যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা এ মহাকাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে তাতে বোঝা যায় কোন গুণে এ গ্রন্থ অমর।

কুষাণ সাম্রাজ্যের শেষ দিকে যে সব ছোট ছোট রাজ্যের উত্থান হচ্ছিল, গোষ্ঠী ও কৌম সংগঠন ভেঙে যে নতুন 'কুল' বা বৃহৎ যৌথ পরিবারের উদ্ভব হচ্ছিল এবং এ-দুটিকে অবলম্বন করে সমাজের যে সব সমস্যা দেখা দিচ্ছিল তা বহুলাংশে রামায়ণে প্রতিফলিত। সৌভ্রাত্র, দাম্পত্য, অপত্যসম্পর্ক, ক্ষত্রিয় বীরের কর্তব্য, শৌর্য, পিতৃসত্য রক্ষা, বন্ধুবাৎসল্য, বংশমর্যাদা রক্ষার জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধ— এ সবই তখনকার রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে বাস্তব সমস্যা। রামায়ণে এগুলি গুরুত্ব পেয়েছে, বিশ্লেষিত হয়েছে। তা ছাড়া, ওই সমাজে বর্ণবিভাজন ক্রমেই কঠোর হয়ে উঠেছিল এবং নারী ও শূদ্রের অবনমন ঘটানোর জন্যে শাস্ত্র রচিত হচ্ছিল; সমাজপতি ও শাস্ত্রকাররা এর অনুকূলে ক্রমেই সক্রিয় হয়ে উঠছিলেন। তিন বর্ণের দাসত্ব শূদ্রের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য বলে পরিগণিত হচ্ছিল এবং পাতিব্রাত্য ও শ্বশুরকুলের প্রতি আনুগত্য নারীর পক্ষে ক্রমেই অবশ্য-পালনীয় হয়ে উঠেছিল। সতীত্ব একটি অপরিহার্য গুণ বলে ধরা হত, ফলে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন সন্দেহেও স্ত্রীপরিত্যাগ হল স্বামীর কর্তব্য। মহাকাব্য তো এ সব নিয়েই গঠিত। এরই পরিসরের মধ্যে রাজ্যে নির্লোভ, পিতৃসত্য রক্ষায় অনমনীয় রাম, শুধুমাত্র স্বামীর প্রতি প্রেমে সীতার চোদ্দ বছরের বনবাসের দুঃসহ ক্লেশ সানন্দে স্বীকার করা, অচিরবিবাহিত লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠের জন্য অকুণ্ঠচিত্তে দীর্ঘ নির্বাসন মেনে নেওয়া, হনুমানের রামের প্রতি অবিচলিত আনুগত্য, জটায়ুর বন্ধুকৃত্য করার মধ্যে দিয়ে বিনা দ্বিধায় ধ্রুব মৃত্যু বরণ করা, সুগ্রীবের রামের প্রতি মিত্রতা এবং সে কারণে কষ্ট স্বীকার— এই সব এবং আরও বহুবিধ মানবিক মূল্যবোধের প্রতিফলন দেখি মহাকাব্যটিতে। তা ছাড়া নিসর্গবর্ণনা— বৃক্ষলতা, অরণ্য, পর্বত, নদী, সমুদ্র, উপত্যকা বর্ণনার সঙ্গেই পশু পাখির বর্ণনা, সূর্যোদয়,

সূর্যাস্ত, রাত্রি, প্রত্যূষ এ সবের যে সুন্দর বর্ণনা তার মধ্যে জীবনের সহজ আনন্দের স্পর্শ আছে। তেমনই মানুষের নানা অবস্থাবিপর্যয়ে যে চিত্তবৈকল্য বা স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ প্রকাশ পায় তারও সুন্দর বর্ণনা এ মহাকাব্য। এই সব উপাদানে সহজেই পাঠক অভিভূত হয়। রাষ্ট্রের সংকট তো বেশি মানুষকে সরাসরি স্পর্শ করে না, বরং তাকে পারিবারিক মূল্যবোধের সংঘাতের সম্মুখীন হতে হয় প্রতিনিয়তই। এই মূল্যবোধগুলি রামায়ণের নানা ঘটনাচক্রের মধ্যে দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে, কাজেই রামায়ণে সাধারণ মানুষ তার সমস্যার চিত্রণ ও সমাধান খুঁজে পেয়েছে; তাই রামায়ণকে ভারতীয় সমাজ সহজে গ্রহণ করেছে আপন স্বল্প পরিসর সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে চিত্তলোকের পথপ্রদর্শন হিসেবে। সেখানে মহাভারতের গতিপথ অনেক জটিল, গভীর তার অনুসন্ধান।

মহত্তর সাধনার দিশা

হোমারের দুটি মহাকাব্যের মধ্যে *অডিসি* রামায়ণের মতো মোটামুটি পারিবারিক ও কতকটা সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পিত। প্রকৃতির হাতে অডিসিউসের সুদীর্ঘ নিগ্রহ, পথে নানা বাস্তব অবাস্তব সংকটের বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধ করে অবশেষে স্বভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে সে আবিষ্কার করে যে, তার স্ত্রী সম্পূর্ণ নিষ্কারণে সুচিরকাল ধরে বিপদে মগ্ন, তরুণ পুত্র টেলিমেকস একা সে সংকটকে যথাসাধ্য ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে মাত্র, কারণ সমাধানের শক্তি তার নেই। অতএব দীর্ঘ নয় বৎসরের বিপৎসঙ্কুল পথ-পরিক্রমার পরে অডিসিউসকে শেষ যুদ্ধ করতে হল স্ত্রীর মর্যাদা রক্ষার জন্য এবং নিজের সম্পত্তি রক্ষা করার জন্যে। এই সুদীর্ঘ ক্লেশ সহ্য করার মধ্যে অডিসিউস মহানায়ক হয়ে ওঠেন এবং মহাকাব্যটি গম্ভীর একটি মাত্রা পায়।

ইলিয়ড-এ ঘটনা জটিল, সংকট গুরুতর এবং সংগ্রাম কঠিনতর। কারণ এ সংগ্রাম অন্তরে বাহিরে। আকিলিস তুচ্ছ কারণে সমবেত যোদ্ধাদের প্রতি কর্তব্য করতে অসম্মত হয়ে যুদ্ধোদ্যম থেকে সম্পূর্ণ সরে এসে নিজের দলের প্রতি এক ধরনের অবিবেচক বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। মেনেলাওসের স্ত্রী হেলেনকে ট্রয়ের রাজকুমার হেলেনের সম্মতিক্রমেই হরণ করে এনেছে। তারই উদ্ধারকল্পে দুস্তর দুঃখের পথ পেরিয়ে মেনেলাওস, আগামেমনন তাঁদের নিজেদের অনুগত সৈন্যদল ও বহুসংখ্যক নৌবাহিনী নিয়ে ট্রয়ের সিন্ধুতটে শিবির নির্মাণ করে যুদ্ধে উদ্যত। এর মধ্যে আকিলিসের যুদ্ধ বিমুখতায় একটা বিপর্যয় সৃষ্টি হল। তবু যুদ্ধ চলল, লোকক্ষয় হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ট্রোজানদের হাতে প্রিয় বন্ধুর মৃত্যু হলে অসহ্য ক্রোধের বশে আকিলিস অস্ত্রধারণ করলেন, যুদ্ধ ধীরে ধীরে শেষ হল। হেলেনকে নিয়ে গ্রিকরা ফিরলেন স্বদেশে।

এ মহাকাব্যের পরিকল্পনাতেই নানা জটিলতা। যে হেলেন স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করেছে, তার পুনরুদ্ধারের জন্য অগণ্য গ্রিক সৈন্য মৃত্যুবরণ করল। ট্রয়ের রাজকুমার প্যারিস পরস্ত্রীহরণ করেছে সত্য, কিন্তু সেটা হেলেনের সম্মতিক্রমেই, কাজেই ট্রয়ের লোকক্ষয় আরও নিষ্কারণ এবং করুণ। যুদ্ধে এসে বীরের পক্ষে অস্ত্রসংবরণ করা অন্যায়, এটা বীরোচিত আচরণ নয়। তবু আকিলিসেব ক্ষোভের, অভিমানের, হেতুটাও যত তুচ্ছই হোক, সত্য। তাই পদে পদে জটিল হয়ে উঠেছে মূল কাহিনির সূত্রগুলি। সাদাকালো বিভাগ এখানে অচল।

সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের নানা সংঘাত এখানে উপস্থিত এবং কোনওটিরই সরলরৈখিক সমাধান বর্ণনা করা হয়নি। তা ছাড়া গ্রিকদের মধ্যে নানা জটিল প্রতিযোগিতা, ট্রোজানদেরও ধর্ম-বিপর্যয়ের অবস্থা, বিভিন্ন বীরের যুদ্ধকালে এবং অন্য সময়েও জীবন মৃত্যু সম্বন্ধে বীরধর্ম, মানবধর্ম সম্বন্ধে নানা বিরুদ্ধ মূল্যবোধের ও চেতনার প্রকাশ এ মহাকাব্যটিকে একটি অসামান্য মানবিক গৌরবে মণ্ডিত করেছে।

পরিশেষে মহাভারত। এর কেন্দ্রে যে যুদ্ধ তা যে কবে কোথায় সংঘটিত হয়েছিল ইতিহাসে তার কোনও নজির মেলেনি। কোনও এক সুদূর অতীতে হয়তো ভারতবর্ষে যে যুদ্ধ ঘটেছিল, কিন্তু সে ভারতবর্ষ সে দিন কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এমনকী মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত কিনা, তা আজ কিছু পণ্ডিত গবেষকের চর্চার বিষয়; স্থির সিদ্ধান্তে আসবার মতো উপাদান এখনও পাওয়া যায় না, এ সিদ্ধান্তের সময়ও তাই এখনও আসেনি। কোনও সময়ে কোনও এক জায়গায় যে একটি ব্যাপক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হয়েছিল, যার ফল ছিল সুদূর বিস্তৃত, এ সম্বন্ধে কোনও সংশয়ের অবকাশ বোধ হয় নেই। এও সত্য যে, যুদ্ধের পরে লোকমুখে বীর-গাথা, যুদ্ধবর্ণনা, বিলাপ, বিজয়বর্ণনা, চরিত্রের বিবরণ, ইত্যাদি দীর্ঘকাল ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হয়তো খ্রিস্টপূর্ব চারশো থেকে খ্রিস্টিয় চারশো সালের মধ্যে— কিছু আগে পরে হতে পারে— এটি মহাকাব্যের রূপ পায়। কোনও মূল সংকলক সম্ভবত পূর্ববর্তী লোকগাথাগুলিকে সংহত একটি রচনায় সন্নিবিষ্ট করে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের কাছাকাছি এর মূল 'জয়' রূপটি নির্মাণ করেন। তার পরে নৈতিক, দার্শনিক, সর্বজনিক, সামাজিক মূল্যবোধের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে নানা পুরোহিত, পুরাণকার, শাস্ত্রকাররা— যা তাঁরা তৎকালীন সমাজের পক্ষে হিতকর বা প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন— সেই বিভিন্ন অংশগুলিকে তত দিনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ এই মহাকাব্যের সঙ্গে সংযুক্ত করেন। তখন এর নাম হল 'ভারত'। এর শেষতম অংশ ভার্গব প্রক্ষেপ হল অভি-পৌরাণিক; আজ যা হিন্দু সমাজ বলে পরিচিত তার মূল শাস্ত্রের উদ্ভব এই অংশে। মূল মহাকাব্যের সঙ্গে এই অংশের কাহিনিগত যোগসূত্র নিতান্তই ক্ষীণ, প্রায় নেই বললেই চলে। বরং, মূল অংশের প্রতিপাদ্য বহু মূল্যবোধের বিরুদ্ধ মতাদর্শ এ অংশে বিস্তৃত ভাবে বিবৃত, বহু দুর্বল উপাখ্যানের দ্বারা তার ভাষ্য রচনা করা হয়েছে।

এই আদি মহাকাব্যটিতে কী ছিল যা একে এমন অনন্য মহিমা দিয়েছে? কীসে এর আদি মহাকাব্যত্ব? একটা জাতি যখন তার উপলব্ধি, বেদনা-যন্ত্রণা, তার অভিজ্ঞতার মূল্যবোধের সংঘাত, তার মর্মস্থলে 'গভীরতম ভূমিতে ধর্মসংকটে উদ্বেলিত হয়ে কোনও কাব্যে সে অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে চায় তখন সে রচনা হয়ে ওঠে সে জাতির গভীরতম সত্তার আত্মপ্রকাশ। স্বাভাবিক ভাবেই এই আত্মপ্রকাশ বিবৃত হয় একটি কাহিনিকে অবলম্বন করে। মহাভারতের ক্ষেত্রে কাহিনিটি ঐতিহাসিক হয়ে থাকলেও এর একটি প্রতীকী মূল্য আছে। ধর্মসংকটে যেমন শ্রেয় এবং প্রেয়ের দ্বন্দ্ব, তেমনই দ্বন্দ্ব প্রেয়-প্রেয়স্তরের এবং শ্রেয়-শ্রেয়স্তরের; আবার, তেমনই দ্বন্দ্ব সমাজে স্বীকৃত বর্ণধর্মের অথবা আশ্রমধর্মের কোনও বিশেষ তৎকালীন ধর্মের কিংবা এ সকলকে অতিক্রম করে যে মানবধর্ম তার সঙ্গে। এই ধরনের দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হলে

মানুষ সহসা বিপর্যস্ত ও উদ্ভ্রান্ত বোধ করে; যে নীতিবোধের আকল্পে সে আশৈশব শিক্ষিত, সহসা তার বিরোধী নীতি যদি কোনও সংকটের মুহূর্তে গ্রহণের দাবি জানায়, তা হলে একটিকে বর্জন করে অন্যটিকে অবলম্বন করবার জন্যে কোনও সর্বজনস্বীকৃত নীতি যেহেতু নেই, সেখানে তাই মানুষকে নিজের অন্তরাত্মার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গ্রহণ-বর্জনের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। মহাভারত তার বহু চরিত্রকে বারে বারেই এই ধরনের ধর্মসংকটের সামনে টেনে এনেছে; ফলে কাব্যটি ধর্ম সংকটের। অতএব এ-কাব্য বাস্তবজীবনে অনুরূপ সংকটে পথপ্রদর্শনের সংকেত দিতে সমর্থ। এইখানে মহাভারতের মহাকাব্য-গরিমা।

এ-কাব্যের কাব্যগুণ অবিসংবাদিত, যদিও ভার্গবপ্রক্ষেপের শেষ দিকে অনেক অংশই এমন সাম্প্রদায়িক পুরোহিতের রচনা যাঁরা কবি নন। ফলে সেই সব অংশে রচনা ক্লিষ্ট; তালিকা, বিবরণ ও ক্লান্তিকর উপদেশাত্মক উপাখ্যানে পূর্ণ। কিন্তু এ সব ছাড়াও মহাভারতে স্বভাবতই কাব্যগুণবর্জিত অন্য বেশ কিছু অংশ আছে; ইতিহাস, ভূগোল, পুরাকাহিনি, উদ্ভিদ ও প্রাণি জগতের বিবরণ, নানা দর্শনপ্রস্থান ও ধর্মানুষ্ঠানের কথা। এগুলি সংযোজিত হয় একটি মহাকাব্য কোনও উত্তুঙ্গ মহিমায় আরোহণ করলে পর। সমাজ তখন সে মহাকাব্যকে ব্যবহার করে গণশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে। কিছু কিছু প্রাথমিক মহাকাব্যেই শুধু এই সব উপাদান আছে, পরবর্তীকালের মহাকাব্যগুলি এ সব পরিহার করে একটি নিটোল কলেবর লাভ করেছে। এর একটা কারণ, ততদিনে ওই সব আগন্তুক বিষয়গুলি স্বতন্ত্র চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে, মহাকাব্যে তাদের সংকলন করবার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

তবু ওই নিটোল কলেবরের শিল্পোত্তীর্ণ রূপ ও ওই বহু আনুষঙ্গিক বিষয়ের দ্বারা কতকটা ভারাক্রান্ত প্রাথমিক মহাকাব্যের মহিমা অর্জন করতে পারেনি। কেন? প্রাথমিক জীবনজিজ্ঞাসার যে একটা অকুণ্ঠ ও তীব্র আকুতি তা শুধু ওই আদিকমহাকাব্যগুলিতেই বিধৃত। পরবর্তী কাব্যগুলি এই বিষয়ে আদিকাব্যগুলির উত্তরাধিকারী। তাদেরও জীবনজিজ্ঞাসা আছে এবং বিভিন্ন দেশকালের প্রথম মহাকাব্যগুলিতে তার তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা ও মূল্যবোধের সংকট ও ঐকান্তিকতাতেই তাদের মূল্য নিরূপিত হয়। সে মূল্য বহু পরবর্তী কালের মহাকাব্যেই গভীর তাৎপর্য লাভ করেছে এবং সর্বদেশকালে কাব্যগুলিকে সমাদৃত করেছে।

কিন্তু আদি মহাকাব্যগুলির একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল, এগুলিই প্রথমবার পৃথিবীতে উচ্চারণ করেছে মানুষের সংশয়, জীবন সম্বন্ধে অতৃপ্তি, অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্যের সঙ্গে সুখ দুঃখের সংগতির অভাবের অভিজ্ঞতায় গভীর হতাশা ও বেদনাদীর্ণ উপলব্ধি: জীবনে কোনও আত্যন্তিক মঙ্গলবিধান নেই। তবু এই মহাকাব্যগুলি আত্মিক ঐশ্বর্যের উচ্চশিখরে স্থাপন করেছে সেই মানুষকে যে প্রাকৃতিক ও দৈবগত বিপর্যয়ে প্রতিক্ষণে বিপর্যস্ত, যে শেষ পর্যন্ত জীবনে ঐহিক জন্মলাভ করবে না, শুধু মর্মমূলে রক্তক্ষরণের মধ্যে দিয়ে খুঁজে যাবে জীবনের সেই নিরঞ্জন মহিমা, যা লাভক্ষতি, জয়পরাজয়কে অতিক্রম করে গেছে। মানুষের শেষতম শত্রু মৃত্যু; *গিলগামেশ* থেকেই দেখি মানুষ মৃত্যুকে পরাস্ত করে অমরত্বের সন্ধান করে চলেছে দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ও কঠিন মূল্যে। মহাভারতেও বক যুধিষ্ঠিরের

সংলাপে জীবন ও মৃত্যু, শ্রেয় ও প্রেয়, আপাতবিরোধী নীতির দ্বন্দ্ব, ধর্মের দ্বান্দ্বিক সত্তা এই সমস্ত বিষয় আলোচিত। কাছে থেকে এবং দূর থেকে জীবনকে দেখতে দেখতে, বহু কঙ্করাস্তীর্ণ পথ পার হতে হতে এবং পার হয়ে এসেও, সত্য মিথ্যা ধর্মাধর্ম সম্বন্ধে অভ্যস্ত বিশ্বাস বারবার আঘাতে দীর্ণ হওয়ার পর কী বাকি থাকে যা মানুষের জীবনকে মূল্যবান করে তোলে?

মহাভারত নানা ঘটনা ও উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে এ প্রশ্ন তুলেছে এবং নানা ভাবে এর উত্তর দিয়েছে। স্পষ্ট উক্তিতে, উপাখ্যানে, বিবরণে, রূপকে, সংলাপে জটিল জীবনের আকল্প নির্মাণ করে দু-তিনটি সত্য প্রতিপাদন করেছে: মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই, কিছু নেই। এরই অনুকল্প হল, যা কিছু মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত তা সব দর্শন, ধর্ম অনুষ্ঠানকে অতিক্রম করে কোনও ঐকান্তিক সত্যলোকে হিরকের মতো কঠিন ও উজ্জ্বল ভাস্বরতায় বিরাজ করে পরবর্তী প্রজন্মের উত্তরণে দীপবর্তিকার মতো দীপ্তি বিকীর্ণ করে। মানুষের যে কাজ মানবগোষ্ঠীর পক্ষে হানিকর তা-ই পাপ; যে কাজ বৃহৎ জনগোষ্ঠীর পক্ষে মঙ্গলকর তা-ই পুণ্য। এবং পাপের পথ অর্থ, যশ অর্জনে আপাত ভাবে সমর্থ হলেও শেষ পর্যন্ত মানবসমাজে ধিক্কৃত। অপর পক্ষে পুণ্যের, সত্যের পথ সুকঠিন, আমৃত্যু সাধনার পথ, বহু দুঃখযন্ত্রণা এবং পদে পদে বিস্তর ব্যর্থতা, অবসাদ এবং হতাশায় আকীর্ণ এ পথ। যে এ সব সহ্য করে সাহসের সঙ্গে দুঃখবরণ করে বৃহত্তর মানব-সমাজের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে, আপাতদৃষ্টিতে সে ব্যর্থ, বঞ্চিত ও উপহসিত হলেও শেষ বিচারে সেই অমরতায় উত্তীর্ণ হয়। মহাভারত এ কথা স্পষ্ট উচ্চারণ করে বলেনি; বললে তা কাব্য হত না। বলেছে কাহিনি, উপাখ্যান, সংলাপ ও নানা আপাতবিরুদ্ধ মূল্যবোধের সংঘাত বারে বারে উপস্থাপিত করে। কোথাও নায়ক হেরেছে সাধনার উপযুক্ত সাহস, ধৈর্য, মূল্যবোধে প্রত্যয় ছিল না বলে, কোথাও বা দুঃসহ মূল্য দিয়ে ঐহিক বঞ্চনাকে উপেক্ষা করে মনুষ্যত্বকে জয়যুক্ত করেছে। এবং সে জয়কে রেখে গেছে চিরকালের মানুষের আত্মিক উত্তরাধিকার রূপে।

রামের নামে বহু মানুষ ও স্থানের নামে ভারতবর্ষে আছে; তত বেশি নাম— মানুষের ও স্থানের— মহাভারতের নেই। তবু মহাভারত যে ভাবে জীবনের মর্মান্তিক নৈতিক সংকটগুলিকে প্রকাশ্যে এনে চরিত্রগুলির অন্তর-যন্ত্রণা ও তার মধ্যে দিয়ে তাদের নৈতিক উত্তরণ দেখছে, রামায়ণে তেমন সংকট শুধু সীতার জীবনেই দেখিয়েছে এবং এখানে উত্তরণটিও এই অন্যায়কারী অযোধ্যা থেকে জননীর ক্রোড়ে, নিরাপদ ও কাম্য আশ্রয়ের মধ্যে দিয়ে। এক দিক থেকে সীতাই পাঠকের দৃষ্টিতে মহনীয়তর চরিত্র; গ্রন্থটি যার নামে সেই রাম পাঠকের দৃষ্টিতে অনেক নেমে গেলেন।